ডিসেম্বর ২০২৫ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

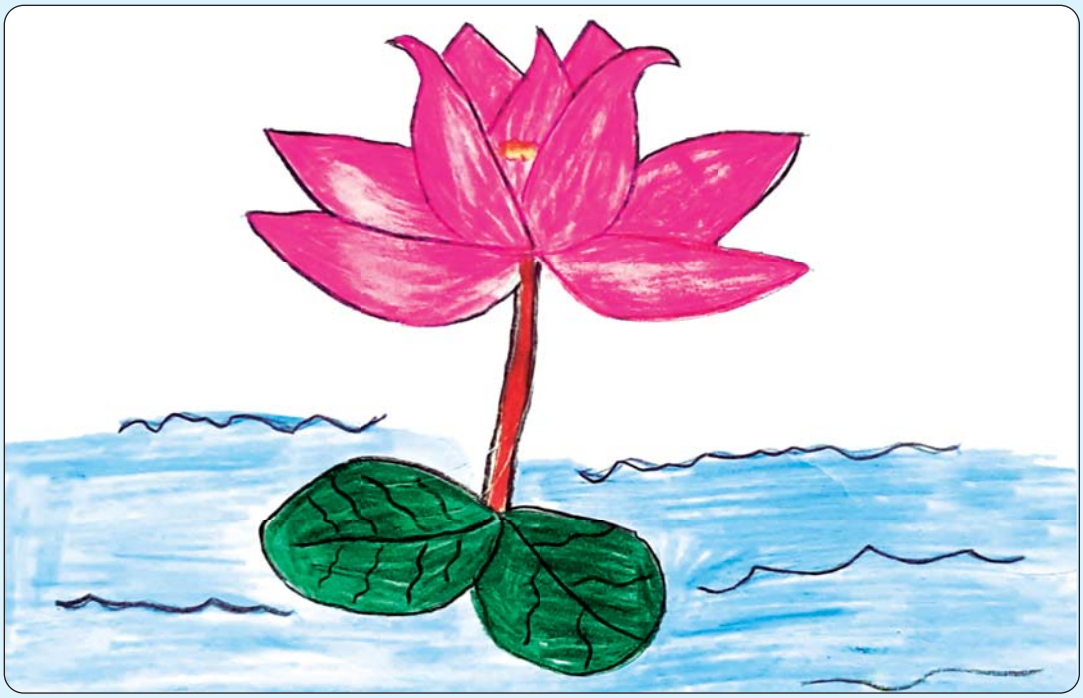
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

লাল সবুজের হাসি





তেরেসা সাঈফ, অষ্টম শ্রেণি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা



খন্দকার নূর এ সুবহা, কেজি শ্রেণি, শহিদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামের স্বাধীন ভূ-খণ্ডের জন্ম হয়। আমরা গর্বিত এই দেশের নাগরিক হতে পেরে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ এখনো কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে পারেনি। আমাদের কাজ অনেক, অনেক পথ যেতে হবে। এই দিনটি মনে করিয়ে দেয় একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার আনন্দ, ত্যাগ আর দায়িত্বের কথা। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ায় আমরা এই দেশের আলো-বাতাসে মুক্তভাবে বেড়ে উঠেছি। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়েছি। এই দেশ ও রাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। আমাদেরও দায়িত্ব আছে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি। সেই দায়িত্ববোধ থেকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে, সুনাগরিক হিসেবে তৈরি হতে হবে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও জ্ঞানচর্চায় নিজেদের উন্নত শিখরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। একটি মানবিক, বৈষম্যহীন, মর্যাদাপূর্ণ, দক্ষ ও উন্নত জাতি হিসেবে যাতে আমরা বিশ্বদরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি সে চেষ্টা করব।

বন্ধুরা, মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা রইল তোমাদের প্রতি। এই দেশ তোমাদের যা দিয়েছে, দেশের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে তোমরা যেন কিছুটা হলেও সেই ঋণ শোধ করতে পারো- সে কামনাই করি এই বিজয়ের মাসে।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
ই-মেইল :
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

০৩ শিশু মনে বিজয়ের চেতনা/ মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
১৩ দেশে দেশে বীর/ সিরাজুল ইসলাম
৩৮ আমাদের আত্মীয়/ নুরুল ইসলাম বাবুল
৪৩ আগামীর বাংলাদেশ/ ইকবাল খান
৪৫ সূর্যের পরিবারের মজার তথ্য/ আসিফ মেহ্‌দী
৪৯ শীতকালে বেশি ঘুম পায় কেন/ কামরুল ইসলাম
৫০ শীতের হলদে সৌন্দর্য/ মো. আরিফুল ইসলাম
৫২ হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ঐতিহ্য ভেসাল/ আইনাল হক
৫৫ বিজয় দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
শাহানা আফরোজ
৫৯ শীতকালে সুস্থ থাকার সহজ উপায়
আসাদুজ্জামান খান মুকুল

গল্প

০৯ ভালোবাসার বিজয়/ কামাল হোসাইন
২০ মুক্তি ও নিশান/ আলমগীর কবির
২২ সবুজের বুকে লাল/ এম আব্দুল হালীম বাচ্চু
২৭ বিজয়ের ভোর/বিপুল বড়ুয়া
২৯ শিমুলদের বস্ত্রের যুদ্ধ/ মুহিব্বুল্লাহ কাফি
৩৩ পাগল বুড়ো/ শাকিব হুসাইন
৪০ সবুজ পৃথিবী/ নূহু আব্দুল্লাহ

প্রতিবেদন

৫৪ আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জয়/
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৬১ চীনের রঙিন পাহাড়/ তারান্নুম সাদিকা

কবিতাগুচ্ছ

০৮ মুসতাফা আনসারী
১৯ রেজুয়ান হাসান রিফাত/ মো. শাহ আলম
২১ সজীব মালাকার
২৫ চান মিয়া চান্দু/ শারমিন নাহার ঝর্ণা
২৬ আহসানুল হক/ নকুল শর্ম্মা
২৮ শ্যামসুন্দর দেবনাথ
৩৬ বিপুল চন্দ্র রায়/ এম. আবু বকর সিদ্দিক
মোহাম্মদ আতিক হেলাল
৪৮ আতিকুর রহমান খান
৫৩ রকিবুল ইসলাম

ছোটোদের ছড়া

০৮ তানভির আহমেদ/ নাজমুল হাসান সানি
৩৭ নাজিম উদ্দিন/ পিয়াস আহমেদ/
মাহবুবুর রহমান শিশির

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : তেরেসা সাঈফ, খন্দকার নূর এ সুব্‌হা
তৃতীয় প্রচ্ছদ : উম্মে হাবিবা
২৪ মাঈশা আহামেদ সুজানা
৩৫ সিয়াম
৬২ নাফিসা তাসনিম স্নেহা/ আয়াতুন নেছা
৬৩ যুনায়না নাওয়ার মুলতাজিম, ফারজানা ঝুমা
৬৪ অর্না তাবাসসুম, শাহ্ মেহমেদ আফনান

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

শিশুমনে বিজয়ের চেতনা

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

বিশ্ব মানচিত্রে মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশের ঠাঁই পাওয়ার দিন বিজয়ের দিন। একাত্তরের এই দিনে কুয়াশা ঢাকা বাংলার আকাশে উদিত হয়েছিল স্বাধীনতার সূর্য। উড়েছিল চির গৌরবের লাল-সবুজ পতাকা। লাখো কণ্ঠ মিলেছিল এক সুরে, 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি...।'

বিজয় শব্দের অর্থ হলো সাফল্য, জয় বা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কর্মে সে জয়ী হতে চায়। পরাধীনতা থেকে মুক্তি চায়। মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। মানুষকে তাই মুক্তিকামী প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পরাধীনতার গ্লানি কোনো মানুষই সহ্য করতে পারে না। স্বাধীনতা সুন্দরকে ধারণ করে। সুন্দরের চর্চার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করা যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আমরা পৃথিবীর বুকে পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশ, যার নাম বাংলাদেশ।



‘সবকটা জানালা খুলে দাও না, আমি -গাইব- গাইব বিজয়েরই গান’। এই গান মানুষের মধ্যে এখনও উদ্দীপনা জোগায়। শিশু মনে এ ধরনের গানের প্রভাব অভাবনীয়। বিজয় দিবস বাঙালির জাতীয় জীবনে অনুভূতিময় আনন্দ-বেদনায় ভরা এক উজ্জ্বল দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে দিনটি একটি রক্তাক্ত তারিখ। বিশেষ স্মৃতি চিহ্নিত এই দিনটিতে বাংলাদেশ অর্জন করেছে মুক্তিসংগ্রামের বিজয়কে। এই দিনে স্বদেশভূমিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালির জাতীয় জীবনের নবতর অধ্যায়। এই দিন থেকে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। আমাদের জাতীয় জীবনে বিজয় দিবস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। বিজয় দিবস বাঙালির আত্মমর্যাদার ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

বিজয় দিবস আমাদের গর্বের। আমাদের জাতিসত্তার মূর্ত প্রতীক। পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের একটি স্বাধীনতা দিবস থাকে, কিন্তু বিজয় দিবস সব দেশের নেই। আমাদের এই বাংলাদেশ সেই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী একটি দেশ। ১৬ই ডিসেম্বর পরাধীন জীবনের অবসান ঘটিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। এই দিনে বাংলাদেশ নামের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। প্রতি বছর আমরা মহাসমারোহে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করি। ১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটি বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় এবং সরকারিভাবে এই দিনটি ছুটি ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক অনুষঙ্গ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এর ইতিহাসও দীর্ঘ। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে আর্যরা এদেশে আগমন করার পর এখানে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আর্য-অনার্য মিলে গঠিত ধারাটি প্রভাব ফেলে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। এরপর যুগে যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, ইংরেজ শাসন বাংলা সংস্কৃতিতে আধিপত্য করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের একটি অংশ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের মানুষ নানাভাবে বঞ্চনা আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর ফলে বহু মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। বিশ্বে আমরা পরিচিত হয়েছি বীর বাঙালি ও বিজয়ী জাতি হিসেবে।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধে অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের বিজয় দিবসের পটভূমিতে রয়েছে জাতিসত্তা বিকাশের অগ্রগামী অধ্যায়। একাত্তরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন। এর মাধ্যমে বাংলা পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতা চেতনাকে নস্যাৎ করার হীন প্রয়াসে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অতর্কিতে হানা দিয়েছিল ঘুমন্ত জনগণের উপর। এরপর থেকে দীর্ঘ ৯ মাস ধরে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাতকে কলঙ্কিত করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে অনেক রক্ত ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে। নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে শহর ও গ্রামের জনপদে। সেদিন বাংলার ছাত্র-শিক্ষক শিল্পী-সাহিত্যিক, ডাক্তার-প্রকৌশলী, কৃষক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনী। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁরা উপহার দিয়েছেন একটি সুন্দর দেশ, বাংলাদেশ। আমাদের সকলের প্রিয় স্বদেশ।

শিশুরা সুন্দরকে ভালোবাসে। বিজয়ে তারা উদ্বেলিত হয়। বিজয়ের সাথে শিশু মনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিশুরা কোমলমতি। সত্য ও সুন্দরের সারথি। তাদের মনে বিজয় আনন্দ বার্তা বয়ে আনে। প্রতি বছর বিজয় দিবসে শিশুরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল



দিয়ে শহিদদের স্মরণ করে। দেশ ও জনগণের কল্যাণে শপথ করে। ভালো কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। শিশু মনে বিজয় দিবসের গুরুত্ব নতুন করে ধরা দেয়। হার না মানার দীপ্ত শপথে তারা তাদের মনকে রাঙায়। আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'জয় তাদেরই হয়, যারা হার মানতে জানে না।' আসলে, পরাজয়কে পেছনে ফেলে সাফল্য অর্জন করাই 'বিজয়'। বাঙালি নির্ভীক, সাহসী আর মাতৃভূমি রক্ষায় অবিচল।

শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুস্থ রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব দেশকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে সহায়তা করবে। ১৯৭১-এ দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দিনটি যেমন বিজয় দিবস হিসেবে পালিত হয়, তেমনি শিশুদের এই দিনে জাতীয় পতাকার রঙে রাঙানো, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের, চিত্রাঙ্কন-আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে তাদের চেতনায় বিজয়কে ধারণ করানো হয়, যা তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলে।

দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; তাই দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ও অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সামরিক কুচকাওয়াজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিজয় দিবস শিশুদের মনে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে। প্রজন্মের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিজয় দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে শিশুদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ চেতনায় উদ্ভাসিত

হলে শিশুরা দেশকে ভালোবাসবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই তারা একটি ভালো মনের নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। দেশ ও মাটির প্রতি এই অবিচল ভালোবাসা জাগরণে বিজয় দিবসের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বিদ্যমান।

শিশুরা সৃজনশীল। তাদেরকে এরূপ কাজে সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। প্রতিবছর বিজয় দিবসে শিশুরা জাতীয় পতাকা আঁকে, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি আঁকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এসব অনুষ্ঠান শিশুদের মনের জগতে দেশের প্রতি মায়ার জাল বিস্তার করে। শিশুদের সৃজনশীল হৃদয়ে যে ভালোবাসার জগৎ তৈরি হয়, তা তাদেরকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এ বিষয়টি সঞ্চারিত হয় ভবিষ্যৎ দেশ গঠনের পরিকল্পনায়।

বিজয় দিবসে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয় এ দিবসে। এ গানগুলো মানুষের মনের কথা বলে। দেশের কথা



বলে। সুন্দর ও সত্যের বারতা দেয়। শিশুরা এসব অনুষ্ঠান উপভোগ করে। গানগুলো তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। শপথ বাক্যের মতো এমন গান মনন জগতে নৈতিকতার জন্ম দেয়। অনুপ্রাণিত করে ভালো কাজে। এসব গান ও অনুষ্ঠানে শিশুদেরকে বেশি বেশি যুক্ত করা প্রয়োজন।

জানাতে হবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বনভোজন ও শিক্ষা সফরের স্থান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর বা স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় স্থানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। এসব স্থানে শিশুরা স্বচক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারবে এবং দেশের প্রতি তাদের মমত্ববোধ বাড়বে। সেইসাথে সঠিক ইতিহাস সম্পর্কেও তারা সচেতন হবে। এসব কর্মকাণ্ডে শিশুদের অংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য হলো তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তৈরি করা, যা আগামীর বাংলাদেশকে শক্তিশালী করবে।

বিজয় দিবস সম্পর্কে ছোট্ট শিশুদের জানানো প্রয়োজন একদম প্রথম থেকেই। কারণ আজকের শিশুরাই আগামীর বাংলাদেশ। শিশুরা যখন ছোটো বয়স থেকেই জানে কীভাবে লাল-সবুজের পতাকা অর্জিত হয়েছে, কত ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ-তখন তাদের মনে দেশের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও দায়িত্ববোধ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। বিজয় দিবস শিশুদের শেখায় আত্মপরিচয়, ইতিহাস জানার আগ্রহ এবং নিজের দেশকে ভালোবাসার মূল্য। তাই বাবা-মা ও শিক্ষকদের সম্মিলিত দায়িত্ব হলো- গল্প, ছবি আঁকা ও সহজ ভাষার মাধ্যমে এই মহান দিনটির তাৎপর্য শিশুদের কাছে তুলে ধরা। আজ ছোট্ট মনে জাগুক দেশপ্রেম, বড়ো হয়ে তারা গড়ে তুলুক সুন্দর একটি বাংলাদেশ- এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

অভিভাবকদের উচিত সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই কিনে দেওয়া এবং তা পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করা। প্রতিটি ঘরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই রাখা জরুরি। এসব গ্রন্থ শিশুর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়াবে। শিশুকে দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধের গান শোনাতে হবে। দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধের গান গাইতেও অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মঞ্চ নাটকও দেখানো উচিত।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন চিত্রসংবলিত প্রচ্ছদের খাতা পাওয়া যায়। শিশুদের লেখার ও ব্যবহারের জন্য এসব খাতা কিনে দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদ দেখে শিশুরা উৎসাহিত হবে। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের চিত্রসংবলিত ড্রইং বইসহ শিশুদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই পাওয়া যায়। যা থেকে তাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে আগ্রহ বাড়বে।

এই বিশেষ দিনে শিশুকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো কিছু উপহার দিলে তারা উদ্বুদ্ধ হবে। বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নানা মোটিফের পোশাক পাওয়া যায়। তা কিনে দিলে তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আরও আগ্রহী হয়ে ওঠবে। এ ধরনের পোশাক পরে বিজয়ের রঙে রাঙাবে শিশুরা। এছাড়াও অবসর সময়ে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্থানে। এভাবেই শিশুকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন মুক্তিযুদ্ধ, বেজয়ের চেতনায়।

বিজয় দিবস বাঙালি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য এ দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ গঠনের প্রত্যয়ে প্রতি বছর বিজয় দিবস আসে। শিশুরা কোমলমতি। তাদের মনের জগতে বিজয় দিবসের গৌরবগাথার ভূমিকা অনন্য। ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে বিজয় দিবস তাদের মনে নতুন পৃথিবীর সন্ধান দেয়। বিজয়ের মূলমন্ত্র ধারণ করে দেশ-মাতৃকার কল্যাণে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। শিশুদের তাই বিজয় দিবস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন শিশুদের নিরাপদ বিশ্ব। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার প্রতি সচেতন হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। ❑

অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

প্রিয় স্বাধীনতা

মুসতাফা আনসারী

যুদ্ধে যাওয়া বীর খোকারা
ফিরলে আপন ঘরে
মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ পেলাম
ষোলো ডিসেম্বরে

যাঁদের ত্যাগে পেয়েছি এই
প্রিয় স্বাধীনতা
ভুলবনা তো কোনদিনও
সেই খোকাদের কথা ।

সেই খোকাদের স্বপ্ন পূরণ
হয়নি আজো তাই
বুকের মাঝে দুঃখ অনেক
কষ্ট ভীষণ পাই !

আপন আপন করে অনেক
দিন যে হলো পার
দেশ ও জাতির জন্য এসো
কাজ করি এইবার ।

এসো নবীন শিশু-কিশোর
শপথ করি আজ
লোভ-লালসা দূরে ঠেলে
করি দেশের কাজ ।

উঠলে জেগে সকল শিশু
ফুটবে রবির আলো
সে আলোতে দূর হবে সব
আঁধার নিকষ কালো ।

স্বাধীন পতাকা

তানভির আহমেদ

পতাকা আজ উড়ে চলে,
গৌরব আনে সবার তরে।
জেনে নিও সেই ইতিহাস,
সাহসী মন করছে উল্লাস।

লক্ষ প্রাণ গেল ঝরে,
বিজয় এল রঙিন ভোরে।
বিজয়ের এই মহান দিনে,
শ্রদ্ধা জানাই সবাই মিলে।

আজকে আমরা মুক্ত স্বাধীন,
তাদের দানে পূর্ণ এই দিন।
রাখব মোরা স্বাধীনতার মান
প্রয়োজনে জীবন দিব কোরবান।

দ্বাদশ শ্রেণি, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, ঢাকা

নতুন বছরের সূর্য

নাজমুল হাসান সানি

নতুন বছর, নতুন আশা,
নতুন বই, নতুন খাতা
চলো করি ভালো কাজ
বদলে দিতে ঘুণেধরা সমাজ।

নতুন বইয়ের গন্ধ নিয়ে,
শুরু হলো পথটি আজ।
জ্ঞান আর ভালো কাজে,
নেই কোনো লোক-লাজ।

নতুন বছরে নতুন আলো,
আমরা হবো সবাই ভালো।
সত্য কথা, সরল পথ,
এই হোক জীবনের শপথ।

একাদশ শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা



গল্প

ভালোবাসার বিজয়

কামাল হোসাইন



দিনটি ১৬ই ডিসেম্বরের সকাল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই রাফি বুঝতে পারল আজকের দিনটা ঠিক অন্য দিনের মতো নয়। এই সকালের বাতাসটা যেন অন্য রকম।

মা প্রতিদিন সকালে উঠে রাফির ঘরের জানালা খুলে দেন। তিনি আজও জানালা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাফি দৌড় দিয়ে ঘরের বারান্দায় চলে এল।

রাফি সামনের দৃশ্যটা দেখে অবাক হলো! তাদের ঘরের বারান্দার রেলিঙের সাথে বেঁধে রাখা একটা লাল-সবুজ পতাকা বাতাসে দুলছে।

পতপত করে উড়ছে আর মনে হচ্ছে যেন পতাকাটা রাফিকে ডাক দিয়ে বলছে, তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে উঠে পড়ো, আজ মহান বিজয় দিবসের সকাল এসেছে যে!

রাফি এ সময় বড়ো করে নিশ্বাস নিল। তার মনে হলো, আজকের এই বাতাসেও একটা গাঢ় মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। যেটা স্বাধীনতার, যেটা আনন্দের, যেটা গর্বেরও বটে।

হঠাৎ রাফির কানে বাবার কণ্ঠ ভেসে এল, রাফি, জেগে উঠেছ নাকি? বেশ করেছ। জানো তো, আজ কিন্তু বিশেষ একটা দিন আমাদের!

জানি বাবা, আজ আমাদের মহান বিজয় দিবস।

বাবা রাফির মাথায় হাত রেখে বললেন, চমৎকার! যাক, তুমি বিষয়টা জানো জেনে ভালো লাগল। শোনো, এই যে সবুজের মাঝে লাল সূর্যের পতাকাটা আনন্দে উড়ছে, এটা পেতে কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এ দেশের সাধারণ মানুষকে।

বাবার কথা শেষ হলে রাফি মাথা নেড়ে বলল, আমি এসবের কিছু কিছু জানি বাবা... তাই তো আজ মহান বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের বিদ্যালয়েও নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমি এখনই বিদ্যালয়ে রওনা দেব বাবা।

এই বলে বাবার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত সে নাশতা খেয়ে তৈরি হয়ে নিল। আজ মোটেও দেরি করা যাবে না। আরও একটু আগে উঠতে পারলেই বরং ভালো হতো। যাই হোক, নতুন আয়রন করা জামাটা পরে রাফি বিদ্যালয়ের দিকে রওনা হলো।

বিদ্যালয়ের আঙিনায় পা রাখতেই রাফির চোখটা বড়ো বড়ো হয়ে গেল!

বিদ্যালয়ের মাঠটাকে আজ রঙিন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। লাল-সবুজ বেলুনে বানানো বড়ো তোরণ, প্রবেশদ্বারে ঝোলানো ফেস্টুন–'মহান বিজয় দিবস'।

মাঠে উড়ছে শত শত পতাকা। সে এক মনোরম দৃশ্য। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল রাফির।

বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেখে অন্য বন্ধুরা ছুটে এল রাফির দিকে। কেউ বলল, রাফি! চল, আজ কুচকাওয়াজ আছে, অংশ নিই!

কেউ বলল, রচনা প্রতিযোগিতা হবে! সেখানে অংশগ্রহণ করবি তো?

কেউ বলল, ওই পাশে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা। তুই সেখানে ছবি আঁকতে বসবি। কারণ, তুই কত সুন্দর ছবি আঁকতে পারিস!

ওরা সবাই মিলেমিশে হাসাহাসি করতে করতে মাঠে ঢুকল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন রাফিদের বিদ্যালয়ের হেডস্যার। তিনি ওদের দেখে বললেন, আজ আমরা শুরু করব মহান বিজয় দিবসের গল্প দিয়ে, কেমন? সবাই চুপচাপ বসো।

সকলে স্যারের সামনে সারিবদ্ধভাবে যে যার মতো বেঞ্চে বসে গেল।

হেডস্যার বলা শুরু করলেন– এক সময় আমাদের এই দেশ ছিল পরাধীন। অন্য একটা দেশের অধীনে ছিলাম আমরা। তখন এখানকার মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারত না। স্বাধীনভাবে চলতে পারত না। ভিনদেশি ওই গোষ্ঠীর অন্যায়,অত্যাচার, জুলুম সহ্য করতে হতো আমাদের। এক সময় এ অত্যাচারের মাত্রা অনেক বেড়ে গেল। তখন এ দেশের মানুষ আর সেই নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করতে চাইল না। অত্যাচারিতদের মধ্যে কিছু সাহসী মানুষ জেগে উঠল। তাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করল। আর প্রতিবাদ করতে গেলেই নেমে আসতে শুরু করল অকথ্য নির্যাতন। এসব দেখে দেখে তারা ঠিক করল, এসব আর সহ্য করা যাবে না।

তারা অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে মুক্তি চায়। স্বাধীনতা চায়! প্রয়োজনে এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

হেডস্যার বলছেন আর ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছে তাঁর কথাগুলো।

স্যার এটুকু বলে থামলেন। তারপর একটু দম

নিয়ে আবার শুরু করলেন, এরপর এদেশের মানুষ একত্রিত হয়ে ভিনদেশি সেই শাসকদের বিরুদ্ধে হাতে যার যা ছিল, তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকে সেই যুদ্ধে জীবন বিলিয়ে দিল। তবুও পিছু হটল না স্বাধীনতাকামী মানুষেরা। দীর্ঘ নয় মাস চলল সেই যুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের আজকের এই দিনটিতে আমাদের বিজয় হলো। আমরা আলাদা স্বাধীন একটা ভূখণ্ড পেলাম। লাল-সবুজের একটা পতাকা পেলাম। আর এজন্যই আজকের এই দিন আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন।

হেডস্যার তাঁর কথা বলা শেষ করলেন। রাফি হেডস্যারের গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, আমরাও একদিন বড়ো হয়ে দেশের বিরুদ্ধে যদি কেউ অমন অত্যাচার-নির্যাতন করতে আসে, তাহলে নিশ্চয়ই দেশ বাঁচাতে লড়াই করব...

কিছুক্ষণ পরেই ঘোষণা হলো–আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা!

রাফি দ্রুত তুলি আর রং নিয়ে বসে পড়ল ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায়।

এ সময় তার মাথায় অনেক আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ বাতাসে দেশের জাতীয় পতাকার পত্‌পত্‌ শব্দ শুনে রাফির মনে একটা আলোর ঝিলিক দিয়ে উঠল।

সে ভাবল–আমি আঁকব আমার দেশকে। যেখানে থাকবে নতুন সূর্যোদয়ের আলো, পাহাড়ের ওপর উড়তে থাকা পতাকা, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব এই ছোট্ট আমি।

এটা ভেবেই রাফি মন দিয়ে তার পরিকল্পনামতো ছবি আঁকতে শুরু করে দিল। ভোরে ওঠা সূর্যের হলুদ আলো, নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, তার মধ্যে একটা বাঁশে বাঁধা বিশাল লাল-সবুজ পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে।

এ সময় হেডস্যার ছবি আঁকার পর্ব পরিদর্শন করতে এসে রাফির প্রায় সমাপ্ত হওয়া ছবিটা দেখে বললেন, রাফি, তোমার আঁকা ছবিটা দারুণ হয়েছে! যেমন আইডিয়া, তেমন ছবি। অসাধারণ। সত্যিই তোমার আঁকার হাত খুব ভালো। এগিয়ে যাও, বাবা।



স্যারের প্রশংসাসূচক কথায় রাফি যেন একটু লজ্জা পেল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ খুশি হলো। এর কিছুক্ষণ পর শুরু হলো বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঞ্চে উঠে বন্ধুরা গলা মিলিয়ে দেশাত্মবোধক গান গাইল।

এই গান গাইতে গিয়ে রাফির শরীরে কেমন যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। এ সময় দেশের প্রতি গর্বে, উত্তেজনায় মনটা বিগলিত হয়ে গেল তার।

পরে সবাই মিলে বিজয়ের ব্যানার নিয়ে বিজয় র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করল। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ চোখে-মুখে খুশি নিয়ে হাত নেড়ে তাদের স্বাগত জানাতে লাগল। রাফি দেখল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অতিশয় বৃদ্ধ, ছোটো ছোটো বাচ্চা, মোড়ের দোকানদার–সবার মুখে আজ এক আত্মতৃপ্তির হাসি।

এই দিনের আনন্দ যেন পুরো এলাকাকেই আজ লাল-সবুজে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান শেষে রাফি বাড়ি ফিরে এল। দাদু তাকে দেখে বললেন, আয় আয়, আজ তোকে মুক্তিযুদ্ধের আসল কাহিনি শোনাবো।

রাফি দাদুর পাশে বসে তাঁর হাতে থাকা একটা বইয়ের পাতায় দেখল মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ট্যাংকের ছবি, মুক্তিযোদ্ধাদের পোশাক, নদী পেরোনোর গল্প, লুকিয়ে থাকা গ্রামবাসীর ভয়ার্ত মুখ।

দাদু রাফির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আমাদের অকুতোভয় বীরযোদ্ধারা শুধু যুদ্ধই করেনি, তাঁরা স্বপ্নও দেখেছিল। আর সেই স্বপ্নের নাম– স্বাধীনতা। যার বাস্তব রূপ তাঁরা জীবন দিয়ে প্রতিফলিত করে গেছে।

দাদুর কাছ থেকে এটুকু শুনে রাফির বুকটা গর্বে ফুলে উঠল।

বিকেল হলে বাবা রাফিকে নিয়ে গেলেন বিজয় মেলায়। সেখানে ঢুকেও রাফি হতবাক। সবখানে আজ লাল-সবুজের ছড়াছড়ি। রঙিন কাগজ, বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা মেলার মাঠ। মাইকে বাজছে দেশাত্মবোধক গান। রয়েছে খেলনার দোকান। সেলফি তোলার স্টল।

এরই মধ্যে একটা মুক্তিযুদ্ধের ছোটো নাটিকা পরিবেশিত হলো। মন দিয়ে সেটাও দেখল তারা।

রাফি মেলা থেকে একটা লাল-সবুজ টুপি কিনল। বাবা তার মাথায় সেই টুপিটা পরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখো, তুমি এখন সত্যিকারের বাংলাদেশি সৈনিক হয়ে গেছ!

রাফি হেসে বলল, আমি আমার দেশ বাংলাদেশকে সব সময় ভালোবাসব বাবা। এই দেশকে কখনো, কোনো অবস্থাতেই ভুলে যাব না। প্রয়োজন হলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো বুকের রক্ত ঢেলে দেব।

একথা শুনে বাবা রাফির কপালে চুমু খেলেন। বললেন, তোমরাই পারবে আগামীর বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে। তোমরা জেগে থাকলে এই দেশকে কেউ আর শোষণ করতে পারবে না।

মেলার বড়ো মঞ্চে উঠে যখন সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাইল, তখন রাফি মনে মনে বলল, আমি একটা স্বাধীন দেশের মানুষ... এটাই আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়! এটা আমার অহংকার।

বাড়ি ফিরে রাফি হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে খেতে বসল। তখন বাবা বললেন, আজকের দিনটা যেমন রঙে ভরা, তোমার মনটা তেমনই রঙিন থাকুক সব সময়। দেশের একজন হয়ে সব সময় থেকো।

খাওয়া শেষে রাফি বারান্দায় গিয়ে আবারও সেই পতাকা দুলতে দেখল। দুলছে পতপত করে। তার মনে হলো, পতাকাটাও বুঝি আজ মন খুলে গান গাইছে! গান গেয়ে সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে সগৌরবে।

রাফিও এ সময় চোখ বন্ধ করল। আর বলল, মহান বিজয় দিবস সফল হোক। আমার দেশ বাংলাদেশ। এই দেশে জন্ম নিয়ে আমি গর্বিত। আনন্দিত।

এভাবেই রাফির জীবনের সেরা বিজয় দিবসের দিনটা শেষ হলো। যেখানে মিশেছিল দেশপ্রেমে ভরা গল্প, বিজয়ের রং আর অপরিসীম ভালোবাসায় পূর্ণ। ❑

প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি



দেশে দেশে বীর

সিরাজুল ইসলাম

বন্ধুরা, বিশ্বের কিছু সংগ্রামী বীর স্বদেশবাসীকে আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বপ্ন দেখান,স্বপ্নের বীজ বুনে দেন আবাসভূমি রচনার। তেজোদীপ্ত ক্ষিপ্রতায় গোটা জাতিকে এগিয়ে দেন। চিন্তা ও আদর্শের মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন। দেশ-বিরোধী শক্তিকে উচ্ছেদ করতে চান। দেশপ্রেমের সাথে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে মৃত্যু ও সংগ্রামকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে

চেয়েছেন এবং দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। বীর সে পুরুষের উৎসাহে অনুপ্রেরণায় মরণপণ সংগ্রামে তাঁর দেশবাসী ধাবিত হয়। নিজ দেশ ও সমাজকে নতুন করে সাজাবার লক্ষে নিরন্তর লড়ে যান। অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে সে লড়াই। এক সময় পুরনো রাষ্ট্র ও সমাজ ভেঙেচুড়ে নতুন জীবনের সূচনা করেন। কেউ কেউ চূড়ান্ত সফলতার সুবর্ণ সিঁড়ি দেখাতে না পারলেও আমৃত্যু লড়ে যান। বিশ্ববাসীর কাছে যাঁরা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। এঁরা নিজ নিজ দেশের ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথিকৃৎ। জনগণের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন বা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এবং নতুন রাষ্ট্র গড়ার অনন্য উদাহরণ হয়ে আছেন। তবে এবার আমরা তাকাব দূরের জানালায়। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন বৈপ্লবিক ভূমিকায়।

ফিদেল কাস্ত্রো সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা

ধনীদের হাত থেকে সব সম্পদ জনগণের করেছিলেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এক দলীয় কিউবার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। সারা বিশ্বে যখন কমিউনিস্ট সরকারগুলো ধ্বসে পড়ছে ঠিক তখন ধনীদের পরিচালিত পুঁজিবাদী আমেরিকার দোরগোড়ায় কিউবাতে সমাজতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরে রেখেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো।

১৯২৬ সালের ১৩ই আগস্ট জন্ম হয় ফিদেল আলেহান্দ্রো কাস্ত্রো রুৎজের। স্পেন থেকে কিউবাতে আসা একজন ধনী কৃষক সন্তান ছিলেন তিনি।

সান্টিয়াগোর ক্যাথলিক স্কুল ও হাভানার কলেজ এল কলেজিও ডে বেলেন-এ তাঁর পড়াশুনা। এরপর ১৯৪০-এর দশকে হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়ার সময়, ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনীতি চর্চা শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ফুলহেনসিও বাতিস্তা এবং কিউবার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার নিবন্ধ লিখে। কিউবার সাধারণ জনগণের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কিউবার লাগামহীন পুঁজিবাদের কারণে দেশটির



যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব এবং একমাত্র জনগণের বিপ্লবের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

১৯৫২ সালে ফুলগেন্সিও বাতিস্তা একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট কার্লোস প্রিয়র সরকারকে উচ্ছেদ করেন। ফলে বাতিস্তা সরকারকে উৎখাতের জন্য 'দ্য মুভমেন্ট' নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। এসময় কিউবা পরিণত হয়েছিল উচ্ছৃঙ্খল ধনীদের স্বর্গরাজ্যে। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে সান্টিয়াগোর কাছে মোনাকাডা সেনা ছাউনিতে একটি ব্যর্থ আক্রমণে বন্দি হন। আদালত তাঁকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়। সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে ১৯৫৫ সালের মে মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মেক্সিকো পালিয়ে যান তিনি। সেখানে তার পরিচয় হয় আরেক তরুণ বিপ্লবী আরনেস্তো চে গুয়েভারার সঙ্গে। কাস্ত্রো ও চে মিলে তরুণ বিপ্লবীদের সংগঠিত করতে থাকেন। মুখে স্লোগান ছিল 'হয় সাম্যবাদ না হয় মৃত্যু'।

১৯৫৬ সালের নভেম্বরে ১২জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইঞ্জিন নৌকায় ৮১ জন সশস্ত্র সঙ্গীকে নিয়ে কিউবায় হাভানার সরকারের বিরুদ্ধে

দু'বছর ধরে গেরিলা আক্রমণ চালান। ১৯৫৮ সালের মে মাসে গেরিলারা হাভানা দখলের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেন। গেরিলারা একের পর এক শহর দখল করে নেয়।

১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে হাভানায় প্রবেশ করে কাস্ত্রোবাহিনি। কিউবার স্বৈর শাসনের বাতিস্তা পালিয়ে যান। পরের মাসে তিনি কিউবার প্রধানমন্ত্রী হন। ছিলেন পার্টিপ্রধান, সেনাপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতিও। কিউবার নতুন সরকার ধনীদের হাত থেকে জনগণকে সব জমি বুঝিয়ে দেবার এবং গরিবের অধিকার সুরক্ষার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। ভিন্নমতের লোকেরা বিদেশে পালিয়ে নির্বাসনে যান।

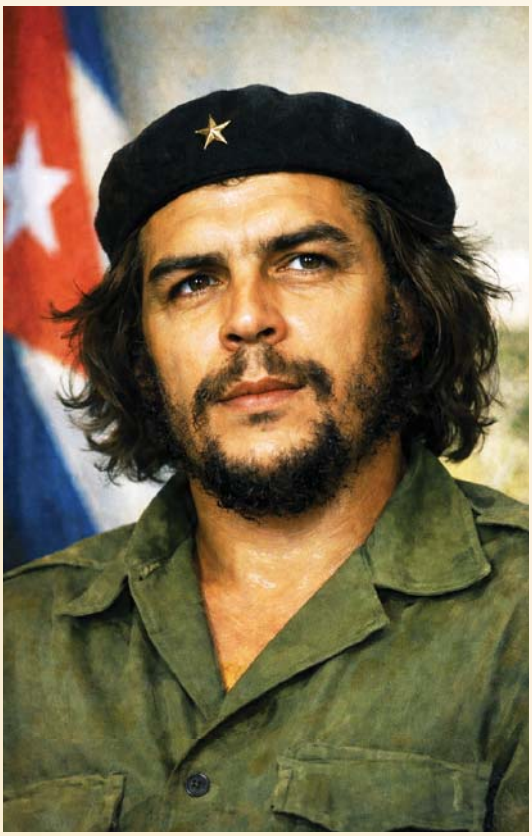
১৯৬০ সালে কিউবাতে থাকা সকল মার্কিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে নিয়ে নেওয়া হয়। জবাবে যুক্তরাষ্ট্র কিউবার উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্র কাস্ত্রো সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালায় একদল নির্বাসিত কিউবানকে দিয়ে দ্বীপটি দখল করিয়ে নেবার মাধ্যমে। ওই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কাস্ত্রো তখন নজর দেন নবগঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দিকে। কাস্ত্রোর শাসনামলে কিউবায় বহু অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন হয়েছে। দেশটির প্রতিটি নাগরিকই বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা পায়। বিশ্বের বহু উন্নত দেশের তুলনায় কিউবায় শিশুমৃত্যুর হার কম। অবশ্য মুক্ত বাণিজ্যের কিছু কিছু দিক গ্রহণ করেছিলেন শেষের দিকে।

২০০৬ সালের ৩১শে জুলাই ৮০তম জন্মদিনের কয়েকদিন আগে ভাই রাউলের হাতে সাময়িক শাসনভার দিয়ে পুঁজিবাদের নাকের ডগায় বিপ্লব সফল করেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। প্রবল শক্তিধর প্রতিবেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে কীভাবে নিজের মতাদর্শে অটল থাকতে হয়,তা বিশ্বকে দেখিয়ে গেছেন কিউবার মহান নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। তাঁকে ৬৩৮ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল! কিন্তু সব ষড়যন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তিনি ৪৯ বছর কিউবা শাসন করেছেন। ২০১৬ সালের ২৫শে নভেম্বর এই মহান বিপ্লবী হাভানায় মৃত্যুবরণ করেন।

চে গুয়েভারা : বিপ্লবের ফেরিওয়ালা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করা চে গুয়েভারা ছিলেন কিউবা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের একটি দেশ আর্জেন্টিনার নাগরিক।



১৯২৮ সালের ১৪ই জুন তিনি আর্জেন্টিনার রোসারিও শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

হাঁপানির সমস্যা থাকায় ঘরবন্দি অবস্থায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আলতা গার্সিয়া নামের ছোটো একটি শহরে গুয়েভারার শৈশব কাটে। বই পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালে তিনি আর্জেন্টিনার ইউনিভার্সিটি অব বুয়েনস আয়ার্সের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হন। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় গুয়েভারা সেখানকার শ্রমিক ও আদিবাসীদের দুঃখ-দারিদ্র্যের জীবন এবং সমাজে শ্রেণিভেদ খুব কাছ থেকে দেখেন, যা তার হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। ভ্রমণ তাঁকে কল্পনার চেয়েও বেশি পালটে দিয়েছে।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের দ্বীপরাষ্ট্র কিউবাতে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। চে গুয়েভারা মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গুয়াতেমালা ছেড়ে মি. গুয়েভারা প্রথমে এল সালভেদর, তারপর মেক্সিকোয় চলে যান। ফিদেল কাস্ত্রোর আহ্বানে গুয়েভারা কিউবার গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শাসক বাতিস্তা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেন। বিপ্লবের পর গুয়েভারাকে কিউবার নাগরিকত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি কাস্ত্রোর নতুন সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। কিউবার শুভেচ্ছা দূত হন।

দেশে ফেরার পর কাস্ত্রো তাকে কিউবার শিল্পমন্ত্রী বানান। একইসঙ্গে, কিউবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরও প্রেসিডেন্ট করেন। সরকারি সব দায়িত্বে ইস্তফা দিয়ে ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে গুয়েভারা আবারও দেশ ভ্রমণ শুরু করেন। কিউবার মতো বিপ্লব তিনি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দেন। গুয়েভারা বলিভিয়ায় পৌঁছান। এর বছরখানেক পরেই ৩৯ বছর বয়সি এই বিপ্লবী দেশটির সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু ততদিনে সারা বিশ্বের মার্কসবাদী বিপ্লবীদের কাছে চে গুয়েভারা এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন।

বিপ্লবী মাও জে দং: আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা

মাও জে দং (Mao Zedong) ছিলেন একজন চীনা কমিউনিস্ট বিপ্লবী, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও নেতা। যিনি ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (PRC) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। তাঁকে আধুনিক চীনের জাতির জনক বলা হয়। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে কৃষকদের উপযোগী করে মাওবাদ তত্ত্ব দেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন।

তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।



দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লব পরিচালনা করেন এবং কৃষকদের সংগঠিত করে তাঁর বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন,যা রেড আর্মি নামে পরিচিত ছিল।

শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবীদের একত্রীকরণ করে তাঁর লড়াই শুরু হয়। তাঁর দৃষ্টিতে খারাপ শ্রেণি মানে হলো বুর্জোঁয়া (শোষক), জমিদার বা বিপ্লব বিরোধীরা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে চারটি পুরনো জিনিসের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল তাদের অভিযান। অভ্যাস, ধ্যানধারণা, পুরনো ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সংঘটনে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর স্থান নিশ্চিত করে।

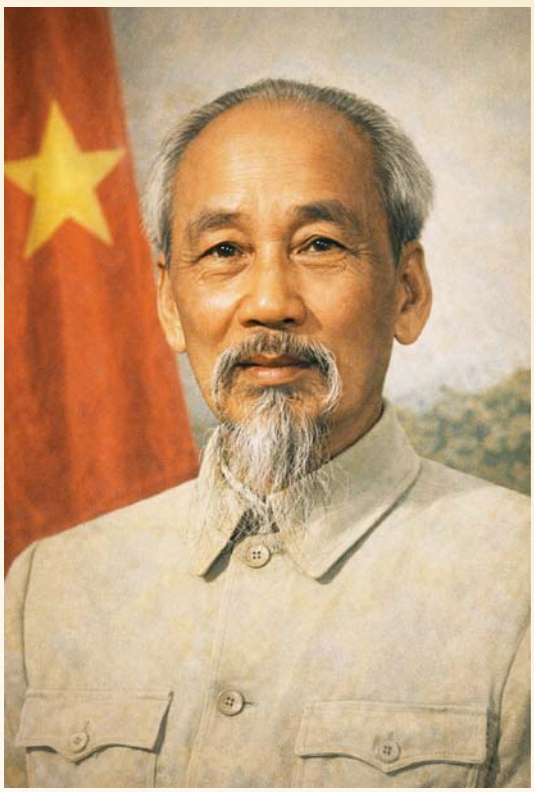
১৮৯৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর চীনের হুনান প্রদেশে এক কৃষক-মহাজন পরিবারে তাঁর জন্ম। কঠোর শৃঙ্খলায় তাঁর শৈশব কাটে। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের গোড়াপত্তন করেন এবং দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলেন। যা আজকের বিশ্বের

অন্যতম বাণিজ্যিক এবং সামরিক শক্তি। তাঁর মৃত্যু ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

হো চি মিন : আঙ্কেল হো

হো চি মিন ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনামের একজন বিপ্লবী নেতা, যিনি ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ও একীকরণে নেতৃত্ব দেন। তিনি ছিলেন উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি (১৯৪৫-১৯৬৯) এবং ভিয়েত কং বা ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রধান। যিনি ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের প্রতীক। ভিয়েতনামীদের কাছে এক শ্রদ্ধেয় ও পথপ্রদর্শক ব্যক্তিত্ব।

১৯৩০ সালে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪১ সালে জাপানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভিয়েতমিন জোট গঠন করেন। তিনি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।



হো চি মিন ভিয়েতমিন স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনা। ১৯৪১ পরবর্তী সময়ে তার নেতৃত্বেই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলমান থাকে এবং ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট শাসিত ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইউনিয়নকে দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধে পরাস্ত করে ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চূড়ান্ত জয় লাভ করে এবং ফরাসিরা সৈন্য নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের (১৯৫৫-১৯৭৫) সময় ভিয়েতনামের পিপলস আর্মি এবং ভিয়েত কং-এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের (দক্ষিণ ভিয়েতনাম) বিপক্ষে বিজয়ী হয়। ১৯৭৬ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের সাথে একত্রিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের পূর্বতন রাজধানী সাইগণের নাম পালটে হোচিমিন রাখা হয় তাঁর সম্মানার্থে। ভিয়েতনামের জনগণের কাছে তিনি আঙ্কেল হো (Uncle Ho) নামে পরিচিত। জন্ম ১৯শে মে ১৮৯০। মৃত্যু, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

নেলসন ম্যান্ডেলা: কালো মানুষদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা

দীর্ঘ ২৭ বছর বন্দি থাকার পর ১৯৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কারাগার থেকে মুক্ত হন দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন। তার মুক্তির এই দিনটির জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার লাখ লাখ কৃষ্ণাঙ্গ অপেক্ষা করছিল। এর মধ্য দিয়েই দেশটিতে অবসান ঘটে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ শাসনের। তাঁর দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন ১৯৬৪ সালে। এই অপরাধে তাঁর সাজা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তাঁর ছবি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এমনকি তাঁকে উদ্ধৃত করে কিছু বলাও ছিল বেআইনি। কিন্তু এসব বিধিনিষেধ তাঁর কারাকক্ষকে প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক প্রতীক হয়ে উঠতে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।



১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। সারা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করে সহিংসতা, ধর্মঘট, বয়কট ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা। অবশেষে পরাজয় মানে শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী।

১৯৯০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্ক পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বর্ণবাদী শাসন অবসানের কথা ঘোষণা করলেন। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এএনসি ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো। রাজনৈতিক নেতাদের ওপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলো। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সহযোদ্ধা কমরেড ও জনতার উদ্দেশে ভাষণে নেলসন ম্যান্ডেলা বললেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, তারা আজ স্বীকার করে নিয়েছেন যে বর্ণবাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ম্যান্ডেলা বললেন, কোনো মহান ব্যক্তি হিসেবে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছি আপনাদের একজন বিনীত সেবক হিসেবে।'

নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনিই ছিলেন ১৯৯৪-১৯৯৯ মেয়াদে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট। তাঁর জন্ম ১৮ই জুলাই, ১৯১৮। মৃত্যু ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৩।

ইয়াসির আরাফাত: আবাসভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলিরা অবরুদ্ধ করে রেখেছে সেখানকার নারী-শিশু স্থানীয়দের। বছরের পর বছর সেখানে জাতি নিধন চলছে। নির্মমভাবে মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে। খাবার-দাবার, পানি সরবরাহ বন্ধ। বিদেশি সাহায্য দিতেও বাধা। এই দৃশ্য আর ঘটনার প্রতিবাদী পুরুষ ছিলেন ইয়াছির আরাফাত (২৪শে আগস্ট, ১৯২৯—১১ই নভেম্বর, ২০০৪)। ছিলেন প্রকৌশলী। কুয়েতে থাকাকালে ১৯৫৮-৫৯ সালে ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। গড়ে তোলেন রাজনৈতিক দল ফাতাহ্। পর্যায়ক্রমে তিনি প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন পিএলওর শীর্ষ নেতৃত্বে আসেন এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শান্তির প্রচেষ্টায় জবরদখল সত্ত্বেও ইসরাইলের বাস্তব অস্তিত্ব মেনে নেন। আইজাক রবিনের সাথে শান্তি-সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হন। যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। যিনি বাংলাদেশেরও একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বাংলাদেশ সফর করেন। তবে রহস্যময়তায় ঘেরা মৃত্যুতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

তার সমর্থকদের চোখে আরাফাত ছিলেন ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের পিতা। অন্যদিকে বহু ইসরায়েলির চোখে তিনি ছিলেন একজন সন্ত্রাসবাদী। তাদের আত্মঘাতী আক্রমণের জন্য শত শত ইসরায়েলির মৃত্যু হয়েছিল।

জীবনের শেষ দুটি বছর ইয়াসির আরাফাতকে রামাল্লায় তাঁর কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে ইসরায়েল। এটি পরিণত হয়েছিল কার্যত এক কারাগারে, যার সাথে বাইরের দুনিয়ার সংযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন।

২৫শে অক্টোবর, ২০০৪। মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার কদিন পর তাঁকে বিমানে করে প্যারিসের কাছে একটি সামরিক হাসপাতালে



নিয়ে যাওয়া হয়। নভেম্বরের ৩ তারিখ ইয়াসির আরাফাত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। সেখানে ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২০২৪ সালের ১১ই নভেম্বর ভোরবেলা মারা যান ইয়াসির আরাফাত। ইয়াসির আরাফাতের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কায়রোতে, সেখানে এক রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যানুষ্ঠান শেষে রামাল্লায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। ❑

তথ্যসূত্র:

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ
বিবিসি নিউজ বাংলা, ২৬ নভেম্বর ২০১৬ এবং অন্যান্য।
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, বিভিন্ন সংখ্যা
প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০২৪
দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, বিভিন্ন সংখ্যা

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, খুলনা বিএল কলেজ



মুক্তিযুদ্ধের গান

রেজুয়ান হাসান রিফাত

একটি দেশ, নাম তার বাংলা,
লড়াই করে হলো সেরা চাঙা।
একাত্তরের সেই সাহসী দিন,
আজও হয়ে আছে রক্তিম।

ভাষার জন্য রক্ত দিলো,
স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনল।
মুক্তিযোদ্ধা সাহস করে,
লড়াই করে রাতে-ভোরে।

গেরিলা যুদ্ধের সাহসিকতা,
মায়ের চোখে ছিল অশ্রুতা।
স্বাধীন একটি পতাকার জন্য,
কত মানুষ শিকার হয়েছে ঘৃণ্য।

বিজয় দিবস

মো. শাহ আলম

লাল- সবুজ পতাকা উড়ে
গর্ব ছড়ায় আকাশ জুড়ে
বিজয় দিবস এসেছে আজ
বাংলাদেশে তাই আনন্দের সাজ।

শহিদের রক্তে কেনা এই দেশ
গৌরবের নেই কোনো শেষ
শিশুকণ্ঠে দেশাত্মবোধ
জাগে মনে নতুন বোধ।

বিজয় মানে স্বাধীনতা
গর্ব ভরা আমাদের কথা
এই গর্বের রাখতে মান
জান করব কোরবান।

গল্প



মুক্তি ও নিশান

আলমগীর কবির

‘রেলগাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম’

জানালার পাশে বসে মনে মনে ছড়া কাটছিল ফাহিম। মা-বাবার সাথে দাদু বাড়ি যাচ্ছে সে। বাবা এক সপ্তাহ অফিসের ছুটি নিয়েছেন। ফাহিমের মনে তো আনন্দ ধরে না। সেও ইশকুল থেকে ছুটি নিয়েছে।

ঢাকা থেকে তারা যাবে নাটোর। সেখানে তার দাদু বাড়ি। ফাহিম মনে মনে অনেক পরিকল্পনা করে রেখেছে। সে তার এই ভ্রমণের কথা ডায়েরিতে লিখে রাখবে।

ঝিকঝিক ঝিকঝিক ঝিকঝিক। মাঠ-প্রান্তর, নদীনালা পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন। ফাহিম মুগ্ধ চোখে সবকিছু দেখতে থাকে। তার নদী পছন্দ। ট্রেন পুলের উপর

আসতেই ঝনঝন ঝন বাজনা বাজতে থাকে।

ফাহিম এখন আর ছোট্টটি নেই। ক্লাস নাইনে পড়ে। তবু বাবা তাকে অনেক কিছু কিনে দিচ্ছেন। চকলেট থেকে শুরু করে পাঁপড় ভাজা, পেয়ারা, শশা মাখানো। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা স্টেশনে এইসব বিক্রি করছে। দুইটা কারণে বাবা এটা-ওটা কিনছেন। ওদের কিছু না কিছু বিক্রি বাড়বে। আর ফাহিম যেন আনন্দ পায়।

হঠাৎ করে ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল। তার মানে সামনে কোনো স্টেশন আছে। ট্রেনের চলার গতি আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এক সময় ট্রেন থেমে যায়। স্টেশনের নাম শরতনগর। এখানে ট্রেন কিছুক্ষণ থামবে। ট্রেন থামতেই যাত্রীদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। কেউ ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছে, নতুন যাত্রী আবার উঠছে। ফাহিম সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে।

ফুল কিনবেন? ফুল কিনবেন ?

ফাহিম দেখে ছোট্ট একটা মেয়ে ফুল বিক্রি করছে। তার সাথে তার চেয়ে বয়সে বড়ো একটা ছেলে আছে। সে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে। পতাকা বিক্রি করছে। ছেলেটি আর মেয়েটি হয়ত বা ভাইবোন।

ফাহিম তাদের ডেকে বলে, আমাকে একটা পতাকা আর দুইটা ফুল দাও।

ফুল দুইটা কিনে বাবা আর মাকে দেয় ফাহিম। পতাকাটা সে তার হাতে রাখে। ছেলেটিকে ফাহিম জিজ্ঞেস করে, তোমাদের নাম কী?

ছেলেটি বলে, আমার নাম নিশান, ওর নাম মুক্তি।

তোমরা কি ভাইবোন?

জ্বি।

তোমরা এত অল্প বয়সেই ফুল-পতাকা বিক্রি করছ?

আমরা স্কুলেও পড়ি। কিন্তু যেদিন স্কুলে ছুটি থাকে সেদিন ফুল-পতাকা বিক্রি করি। আমাদের বাবার কাজে আমরা সাহায্য করি।

এই কথা বলে ছেলেটি মিষ্টি একটা হাসি দেয়। ভারি চমৎকার সেই হাসি!

একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি তোমাদের?

হ্যাঁ।

তোমাদের দুজনের সুন্দর নাম কে রেখেছেন?

নিশান বলে, আমার দাদু রেখেছেন। আমার দাদু মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।

কথা বলার মাঝেই ট্রেনের বাঁশি বেজে ওঠে। পুরো গল্পটা আর শোনা হলো না। তবে ভেতর থেকে শ্রদ্ধাবোধ আর ভালো লাগা কাজ করতে থাকে ।

ফাহিমের চোখের পাতায় ভাসতে থাকে নিশান আর মুক্তির হাসি। নিষ্পাপ মুখের মিষ্টি হাসি। ❑

শিশু সাহিত্যিক

লাল-সবুজের হাসি

সজীব মালাকার

লাল-সবুজের হাসি হাসে
আমার বাংলাদেশ,
এই হাসিটি হয় না মা গো
কভু তো নিঃশেষ।

এই হাসিটি কেনা মা গো
দামাল ছেলের রক্তে,
যে ছেলেরা যুদ্ধে ছিল
রাত ও দিনের অক্তে।

তাই তো মোরা যাই হেসে যাই
এই হাসিটি রোজ,
এই হাসিতে পাই মা মোরা
সব শহিদের খোঁজ।

একাত্তরের মুক্তি সেনা
এই হাসিটির মূলে,
আমরা যেন যাই না কভু
তাদেরকে যে ভুলে।

গল্প

সবুজের বুকে লাল

এম আব্দুল হালীম বাচ্চু



হারান মিয়া ভোরবেলা মাঠের আল ধরে হাঁটছিলেন। শীতের কুয়াশা তখনো পুরোপুরি কাটেনি। দূরে ধানক্ষেতের সবুজের মাঝে লালচে সূর্যটা ঠিক যেন পতাকার রং মিশে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে। হারান থমকে দাঁড়ালেন। বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে উঠল। এটা বিজয়ের মাস। এই মাসেই তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর বড়ো ছেলে ইউসুফকে।



ইউসুফকে তিনি শেষ দেখেছিলেন মে মাসের এক রাতে অস্ত্র হাতে মুক্তিসেনার বেশে। তরুণ ছেলেটার চোখে তখন দাউদাউ করে জ্বলছিল স্বাধীনতার আগুন। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হারান মিয়া বলেছিলেন, 'বাবা, সাবধানে যাস।' ইউসুফ সেদিন হেসে হেসে বলেছিল, 'দেশের জন্য বেরিয়েছি বাবা। ভয় কীসের?' কিন্তু ফেরেনি সে। সেদিন যুদ্ধে ঝরে গিয়েছিল অনেক তরুণদের প্রাণ। হারান মিয়া ছেলেকে আর কাছে পাননি। কেবল পেয়েছিলেন তার রক্তে রাঙা মাফলারটি।

সেদিনের পর কেটে গেছে প্রায় চুয়ান্ন বছর। জীবনের নানা ঝড়ঝাপটা পাড়ি দিয়ে আজও তিনি বেঁচে আছেন। গ্রামের মানুষ জানে, হারান মিয়া নিঃশব্দ এক যোদ্ধা। যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ব্যথাটা বুকে নিয়ে হাঁটেন, কিন্তু কারো সামনে আবেগ দেখান না। কেবল প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর তিনি ভোরে এসে দাঁড়ান মাঠের সীমানায়; যেখানে আকাশের লাল আর জমিনের সবুজ এক হয়ে যায়।

যেন ফিরে আসে বিজয় দিবস।

এখন গ্রামেগঞ্জে নতুন প্রজন্ম। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পতাকা হাতে নিয়ে যাচ্ছিল সমাবেশে। তাদের একজন শাহিন, হারান মিয়াকে দেখে থেমে গেল। বলল 'চাচা, আপনি যাবেন না? আজ তো শহিদদের জন্য অনুষ্ঠান।' হারান মিয়া একটু হাসলেন। 'যাব না কেন, বাবা? শুধু একটু দাঁড়িয়ে আমার ছেলের

কথা মনে করছিলাম।' শাহিন লাজুক স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'চাচা, ইউসুফ ভাইয়ের গল্পটা কি শোনাবেন? আমাদের শিক্ষক বলছিলেন তিনি নাকি অনেক সাহসী ছিলেন।'এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই শাহিন ছেলেটাও একই গ্রামের আরেক মুক্তিসেনার ছেলে। হারান মিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'সাহসী তো ছিলই। কিন্তু তার থেকে বেশি ছিল দেশের প্রতি প্রেম। সে বলত, দেশের মাটির গায়ের সবুজ, আর মানুষের রক্ত লাল। এই দুটো রং মিলে যা হয়, তাই তো আমাদের পতাকা।' শাহিন তাঁর কথা মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে নিজের পতাকাটা তুলে ধরে বলল, 'চাচা, আমরা ওদের মতো হতে চাই। দেশকে ভালোবাসতে চাই।' হারান মিয়ার চোখ দুটো ভিজে উঠল।

তিনি বললেন, 'দেশকে ভালোবাসা মানে শুধু যুদ্ধ না, বাবা। সৎ থাকা, পরিশ্রম করা, অন্যকে সাহায্য করা, এগুলোও দেশরক্ষার চাবিকাঠি। ইউসুফ যদি আজ বেঁচে থাকত, তাহলে তোমাদের মতো ছেলেমেয়েদের নিয়েই স্বপ্ন দেখত।' বাচ্চারা এগিয়ে এসে হারান মিয়ার হাত ধরল। যেন তারা অজান্তেই ইউসুফদের অসমাপ্ত স্বপ্নের অংশ হয়ে গেল। সমাবেশের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হারান মিয়া দেখলেন; সবুজ ধানক্ষেতের ওপর লাল সূর্যটা ঠিক যেন হাসছে। ঠিক যেন ইউসুফের মতোই। তিনি গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন! আর চোখ মুছলেন!

'সবুজের বুকে লাল' এ শুধু পতাকার রং নয়, এ দেশের মানুষের হৃদয়ের রং। আজ তিনি একা নন। তাঁর পাশে আছে নতুন প্রজন্ম; যারা এই রং-কে বুকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাবে। দেশ বাঁচবে তাদের স্বপ্নে, তাদের ভালোবাসায়।

হারান মিয়া ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে বললেন- 'যতদিন এই সবুজের বুকে লাল থাকবে, ততদিন আমার ইউসুফ এবং ইউসুফের মতো লাখো বীরদের আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যাবে না।' ❑

গল্পকার



মাঈশা আহামেদ সুজানা, চতুর্থ শ্রেণি, দারুল উলুম ছায়িদীয়া দাখিল মাদরাসা, বাসাবো

কবিতাগুচ্ছ



দেশ ভাবনা

চান মিয়া চান্দু

এদেশ আমার মায়ের মতো
সবুজে মন মাতায়
বৃষ্টির পড়ে রূপালি জল
পাই কচুর পাতায়।

এদেশ আমার মায়ের মতো
নদীর চমক দেশে
গাছে গাছে পাখি ডাকে
শুনি রাতের শেষে।

এদেশ আমার মায়ের মতো
খুশি বাড়াই দিলে
সাদা বকের শাড়ি
দেখি শাপলা ফোটা বিলে।

এদেশ আমার মায়ের মতো
প্রজাপতির ধানে
মাটির গন্ধ পাই
বাউল মাঝির গানে।

বিজয় নিশান

শারমিন নাহার ঝর্ণা

বিজয় নিশান হাতে নিয়ে
গর্বে ভরে বুক,
বিজয় নিশান হাতে নিয়ে
পেলাম অনেক সুখ।

লাল-সবুজের নিশান হাতে
বিজয়ের গান গাই,
বিজয় সুখে হৃদয় নাচে
বিষাদ ভুলে যাই।

বিজয় নিশান ওড়ে যখন
বাংলাদেশের বুকে,
লাল-সবুজের নিশান দেখে
হৃদয় ভরে সুখে।

এই নিশানের জন্য যারা
দিয়ে গেল প্রাণ,
হৃদয় থেকে জানাই তাদের
শ্রদ্ধা ও সম্মান।



একাত্তরের দিন

আহসানুল হক

একাত্তরের দিনগুলোকে
ভোলা কি যায় ?
ঝলসে ওঠে বারে বারে
স্মৃতির জানালায় !

দিনগুলো সব বিভীষিকার
আঁধার -বিষাদময়
আবালবৃদ্ধ যুদ্ধে ঝাঁপায়
ভুলে মৃত্যুভয় !

কেউবা যে হয় পিতৃহারা
কেউবা হারায় বোন
শোক-বেদনায় ভিজে আজও
মায়ের চোখের কোণ !

রক্ত-লালে অবশেষে
দেশ আমাদের হয়
ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
যুদ্ধে আসে জয় !

একটি বিজয়

নকুল শর্ম্মা

একটি বিজয় দেখব বলে
ঘরবাড়ি হলো ছাই,
লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগে
বিজয় শব্দটি পাই।

একটি বিজয় দেখব বলে
ভাইয়ের ব্যথা ভুলি,
বিশ্বের বুকে বীর বাঙালি
ঊর্ধ্বে মাথা তুলি।

একটি বিজয় দেখব বলে
মায়ের চোখের জল,
পাথরচাপা রক্তগঙ্গায়
বইছে কলকল।

একটি বিজয় দেখব বলে
ইতিহাসের পাতায়,
মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ
বাংলাদেশের খাতায়।





গল্প

বিজয়ের ভোর

বিপুল বড়ুয়া

বিজয়ের ভোর। এক অপরূপ ভোর। সারা বছরের অন্য ভোরের সঙ্গে এ ভোরের তুলনাই হয় না। এ যেন এক ব্যতিক্রমী ব্যঞ্জনার ভোর। এক সংগ্রামী চেতনার ভোর।

তুতুন প্রাণ ভরে অনুভব করে অনেক রক্ত ঝরার এ ভোরকে। তার অন্যান্য ভোরের সাথে তুলনা করতে গিয়ে এ বিজয়ের ভোরকে অনেক মর্যাদাবান ভোর হিসেবে নিতে খুব সময় লাগে না।

সেই কাক ডাকা ভোরেই যেন শপথে বলীয়ান হয়ে ডেকে যাচ্ছে একের পর এক বিজয়ের মিছিল শহিদ স্মৃতিসৌধের দিকে।

তুতুনের ভাবনায় নিমিষে জেগে ওঠে অটল হিমালয়ের মতো সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা শহিদস্মৃতি বেদি ও শপথ রাঙা ছবি।

ফুলের অপরূপ সজ্জায় যেন সেজে আছে সেই শহিদবেদি। তুতুনের বুক এ সময় আনন্দে ভরে যায় মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করা বীর যোদ্ধাদের কথা মনে করে। শহিদস্মৃতি বেদি

পাদদেশের বিশাল চত্বরে ফুলের সাজি, স্তবক, মালা ছড়ানো ফুলে কী যে চমৎকার শ্রদ্ধার আবহ ছড়িয়ে পড়েছে তা ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে তুতুনের।

তুতুন এ সময় হারিয়ে যায় ১৬ই ডিসেম্বরের স্মৃতিবহ বিজয়ের ভোরে। মিছিলের পর মিছিল। স্লোগানের পর স্লোগান।

তুতুনের বোধ ও বিশ্বাসে এ সময় যেন জেগে ওঠে সেই ফেলে আসা একাত্তরের সোনালি প্রভাত, শপথের কথামালা। সাগরের উত্তাল জোয়ারের মতো বাঙালির বিজয় উদ্‌যাপনের দিনক্ষণ। মহান একাত্তরের স্বাধীন জনতার অদম্য উচ্ছাস মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের গৌরব গাথার সমুজ্জ্বল অনুরণন।

তুতুনের মন ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে পরাজিত পাকিস্তানি হায়েনাদের প্রতি। দীর্ঘ সময়ের শাসন-শোষণের পরও একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে কী অরাজকতা, নৃশংসতা, ক্রুরতার আচরণ করেছে তারা বাঙালির সাথে।

এত সবের পরও বীর বাঙালির বুকের রক্ত ঢেলে হত্যাযজ্ঞকে পরোয়া না করে সীমাহীন বৈরিতার পর বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবনমরণ যুদ্ধ করে এই বাংলার বিজয় এনেছে। হানাদারের শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতির মুক্তি এনেছে। অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন করেছে সোনার বাংলাকে।

তাই তো বিজয়ের ভোরে-বিজয়ের দিনের ভোরে শত বেদনার হাহাকারের মাঝে তুতুন গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদেরকে।

বিজয়ের এই ভোর তুতুনকে এক অন্য আলোর ভুবনে ডেকে নিয়ে যায়। তুতুনের হাতে দেয় লাল-সবুজের স্মৃতিময় একটি পতাকা, মুষ্টিবদ্ধ করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। বিজয়ের ভোরের ব্যঞ্জনায়। ❑

শিশুসাহিত্যিক



ইচ্ছেরা

শ্যামসুন্দর দেবনাথ

ইচ্ছেরা উড়ে যায়
বলাকার পাখায়
আকাশ গিলে খায়
কাশবন মাথায়।

ইচ্ছেরা জেগে ওঠে
মৃদুলা হাওয়ায়
ফুলেরা হেসে ফোটে
নির্ঝরা মমতায়।

ইচ্ছেরা পচে মরে
বিষাক্ত হাওয়ায়
বৃক্ষের পাতা ঝরে
ছাগলের ক্ষুধায়।

গল্প

শিমুলদের বস্ত্রের যুদ্ধ

মুহিব্বুল্লাহ কাফি



গত সপ্তাহে মধ্যরাতে তিনজন মিলিটারি এসে কামাল মাস্টারকে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। যে গাছ কামাল মাস্টার লাগিয়েছিলেন তার নিচে শিমুলের মা দাঁড়িয়ে এ বাড়ির বউ হওয়ারও বেশ আগে এ গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি। পরম যত্নে দেখভাল করতেন গাছটির। শিমুলের মা বউ হয়ে এ বাড়ি এলেন। শিমুল জন্মালো। গাছের নামের সাথে মিল রেখে ছেলের নাম রাখলেন শিমুল। বাড়ির উঠোনে দক্ষিণ কোণঘেঁষা বিষণ্নবদনে দাঁড়িয়ে থাকা সে শিমুল গাছের সাথেই কামাল মাস্টারকে বাঁধল মিলিটারিরা। রোকেয়া বেগম কিছু বুঝে উঠার আগেই বিকট শব্দে বাড়ির উঠোন কেঁপে উঠল। ঘুমিয়ে থাকা ঘুঘুটা শিমুল গাছের মগডাল থেকে ডানা ঝাপটিয়ে উড়াল দিলো। কামাল মাস্টারের নিথর দেহ পড়ে রইল গাছের সাথে নতজানু হয়ে। রোকেয়া বেগম আল্লাহরে বলে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন শিমুল গাছের নিচে, স্বামীর পায়ের কাছে।

শিমুল দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত কামড় দিয়ে সটান দেহে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের চৌকাঠে। ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল ক্ষোভে, শোকে। প্রচণ্ড শীতেও চিবুক বেয়ে এক চিলতে ঘাম জড়ো হয়ে টপকে পড়ল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ না করতে পারার ক্ষোভে। কিন্তু কিছুই করতে পারল না শিমুল। শুধু দু'চোখের

দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল আট বছরের শিমুলের কপাল বেয়ে।

শিমুলদের আদরপুর প্রাথমিক স্কুলেই ক্যাম্প গেড়েছে পাকবাহিনী। কামাল মাস্টার সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একটা পা অচল থাকায় সামিল হতে পারেননি মুক্তিবাহিনীদের সাথে। কিন্তু তিনি বিভিন্নভাবে সলাপরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। সে কারণেই পাকবাহিনী তাকে গুলি করে হত্যা করল।

দুই

নিশিরাত। ঝিঁঝির মিহি গুঞ্জরণে রাত গভীর হচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমেছে শিমুলদের উঠোনে। আজ রাত বোধহয় অমাবস্যায় সেজেছে। রোকেয়া বেগম শিমুলকে বুকে চেপে ধরে আছেন। শিমুল ঘুমোচ্ছে। কিন্তু রোকেয়া বেগমের চোখের কোণে তন্দ্রাও নেই। এই যুদ্ধের রাতে সেই শিমুল গাছের ঘুঘুটাও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। ঘুম নেই তার চোখেও। নেই টুঁ শব্দ-ও। মাঠঘাট, পুকুরপাড় কিংবা বাড়ির উঠোন, সব জায়গায় আতঙ্কের ছায়া। শেষরাত্রি কিংবা ভরদুপুর আকস্মিক থেকে থেকে ভেসে আসে চিৎকার, আর্তনাদ। কখনও পিনপতন নীরবতা। কখনও আবার জমিন কেঁপে ওঠা গুলির আওয়াজ। থেকে থেকে ভেসে আসে কান্নার-গোঙানির ভয়ংকর আওয়াজ। ভেসে আসে শীতের হিম ধরা দখিনা বাতাসের সাথে পোড়া পোড়া গন্ধ।

রোকেয়া বেগম এই গভীর রাতে টের পেলেন দরজার ওপাশে কারো চলাফেরার শব্দ। তিনি আঁতকে উঠেন বটে কিন্তু বিচলিত হলেন না। কারণ, এই ভয়াল যুদ্ধের রাতে তার ঘরে শুধু যে মিলিটারি হানা দেয় এমন না। আসে মুক্তিবাহিনীরাও। তাই রোকেয়া বেগম সাহসিনীর মতো হাঁক ছাড়লেন, কে, কে ওইখানে?

দরজায় দু-তিনটে কড়া নড়ে ক্ষীণস্বরে জবাব এল দরজার ওপাশ থেকে। ভাবি আমি রফিক। মুক্তিযোদ্ধা রফিক।

সেও আদরপুর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিল।

রোকেয়া বেগম বিছানা থেকে উঠলেন। দিয়াশলাই দিয়ে কুপিতে আগুন দিলেন। মৃদু আলোয় দরজা খুলতেই পাঁচজন মুক্তি তড়িঘড়ি করে ঢুকে পড়লেন। দরজা লাগিয়ে দিলেন রোকেয়া বেগম।

রফিক শীতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভাবি পেটে খুব খিদা। কী আছে তাড়াতাড়ি দাও। সূর্য উঠার আর বেশি সময় নেই।

ভাই, তেমন কিছুই নেই। কয়টা পান্তাভাত আছে সানকিতে। কথাটা বলে মুখটা শুকিয়ে নিলেন রোকেয়া বেগম। 'তাই দাও' বলে মাটিতেই বসে পড়ল তারা।

রোকেয়া বেগম সানকি থেকে পান্তাভাত দিলেন। শীতের রাত। পান্তাভাতে হাত দিতেই আঙুল শক্ত হয়ে আসে। খুব কষ্টে মুষ্টিবদ্ধ করে কাঁচামরিচ দিয়েই সাবাড় করতে লাগল তারা।

রোকেয়া বেগম বললেন, কালকে কী তোমরা আসবা? তাহলে আগে থেকে কিছু একটা ব্যবস্থা করে রাখব।

রফিক কাঁচামরিচে কামড় দিয়ে বলল, বলতে পারি না, আসতেও পারি নাও আসতে পারি।

খানা শেষ। তারা যেই বের হবে তখনি ঘুম ভেঙে যায় শিমুলের।

শিমুল কুপির নিভু নিভু আলোয় দেখল শীতে রফিক খটখট করে কাঁপছে। পরনে পাতলা সুতি গেঞ্জি। গেঞ্জির দু-তিনটে ছিদ্র বুকের ওপর হা করে তাকিয়ে আছে শিমুলের দিকে। পুরোনো লুঙ্গি। নাকে-মুখে গামছা পেঁচিয়ে বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কারো আবার শরীর ফুটা ও তালিযুক্ত চাদর দিয়ে মোড়ানো। সবাই শীতে দাঁত কামড়িয়ে গরম ধোঁয়া ছাড়ছে।

তারা চলে গেল। শিমুল মায়ের কাছে জানতে চায়, মা তাদের কী একটাও ভালো কাপড় নেই?

রোকেয়া বেগম শিমুলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাবা তারা মুক্তিযোদ্ধা। নিজের ও পরিবারের জানবাজি রেখে যুদ্ধে নেমেছে এ দেশ স্বাধীন করবে বলে। খেয়ে না খেয়ে, পরে না পরেই যুদ্ধ করছে। তাদের কি আর পৌষ-মাঘ আছে। আছে শুধু একটাই শপথ- দেশ স্বাধীন করা।

বাকি রাতটা শিমুলেরও নির্ঘুম কাটল ভাবতে ভাবতে। তারা এই দেশ স্বাধীন করবে কিন্তু এই শীতে একটা ভালো কাপড়ও নাই তাদের।

তিন

ভোর হলো। কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলোকরশ্মি ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগল। শীতের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে শিমুল গেল বন্ধু সাহেদ ও লিটনের কাছে। তারা সহপাঠী। শিমুলরা আদরপুর প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু ওই স্কুলে এখন পাকবাহিনীদের ক্যাম্প।

তিন-চারজন একসাথে হওয়া নিষেধ। তাই তারা আড়ালে সলাপরামর্শ করার জন্য বসল।

শিমুল বলল, আমরা ছোটো বলে আমাদের যুদ্ধে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু আমরাও এ দেশ স্বাধীন করার জন্য কিছু করতে চাই।

কিন্তু সেটা কীভাবে করব? বলল লিটন।

শিমুল বলল, গতরাতে রফিক স্যারসহ পাঁচজন মুক্তি আমাদের বাসায় আসছিল। কিন্তু এই শীতেও তাদের পরনে তেমন কোনো কাপড় নেই। তারা শীতে কাঁপছিল।

সাহেদ বিস্ময়ান্বিত হয়ে বলল, এই হাড় কাঁপা শীতেও তাদের কোনো কাপড় নেই!

হুম, তাই ভাবছি আমরা তাদের কিছু কাপড় দেবো, বলল শিমুল।

লিটন বলল, কিন্তু আমরা এত কাপড় কোথায় পাবো?

শিমুল বলল, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আছে।

সাহেদ বলল, তুই কী বলছিস আমাদের ঘরের কাপড় মুক্তিবাহিনীদের দেবো।

লিটন বলল, সেগুলো আর কয়জনের হবে?

শিমুল বলল, শুধু আমাদের ঘরের কাপড়-ই না। যোগাড় করতে হবে অন্যত্র থেকেও।

কিন্তু সেটা কীভাবে, কে-ই বা আমাদের তাদের বস্ত্র দিবেন? একসাথে বলে উঠল সাহেদ ও লিটন।

শিমুল বলল, দেখ, এটা কোনো ব্যাপারই না। যদি আমরা একটু সাহস করি। একটু ঝুঁকি নিই মুক্তিবাহিনীর জন্য, দেশের জন্য।

প্রথমে আমাদের ঘরের অতিরিক্ত কাপড় সংগ্রহ করব। যেমন মিলিটারিরা আমার বাবাকে শহিদ করে দিয়েছে। তাই আমার বাবার শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি; সবই আমি দিয়ে দিব।

তোদের বাবা-ভাইদের অতিরিক্ত কিছু জামাকাপড় নিয়ে আসবি।

তা না হয় আনলাম। কিন্তু অন্যদের থেকে কীভাবে নিব? বলল লিটন।



শিমুল বলল, যাদের মিলিটারিরা শহিদ করে দিয়েছে তাদের বাড়িতে যাবো। হরিদাশ দাদুর মতো যারা ভারতে চলে গিয়েছে তাদের বাড়িতেও যাবো এবং জামাকাপড় সংগ্রহ করব।

যেই কথা সেই কাজ।

শিমুলরা নিজেদের ঘরের জামাকাপড় একত্র করল। চুপিসারে আশপাশের ঘরবাড়িতে গিয়েও কিছু কাপড় সংগ্রহ করল। মুক্তিবাহিনীর কথা বলতেই তারা খুশিমনে জামাকাপড় দিয়ে দিয়েছেন। অনেকে তো নিজেদের শুকনো খাবার, গুড়মুড়িও দিয়েছেন।

সন্ধ্যে নামবে। এমন সময় আরো কিছু জামাকাপড় সংগ্রহ করল শিমুলরা। ওই সব ঘরবাড়ি থেকে যারা ভারতে চলে গেছেন।

শিমুলদের ঘরে বেশকিছু জামাকাপড় ও কিছু শুকনো খাবার একত্র হলো। সেগুলোকে দুটি গাঁটরিতে রেখে গিঁট দিয়ে রাখল শিমুল। এদের এমন কাজ দেখে রোকেয়া বেগমের চোখে পানি এসে গেল। তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, তোমরা তাদের সাহায্য করছ যারা এ দেশ স্বাধীন করার জন্য বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছে। তোমরাও তাদের মতো মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযোদ্ধা উপাধি পেয়ে তিন বন্ধুর শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল। একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কথা বলল। সময়-সুযোগ পেলে আমরাও এ দেশ স্বাধীন করার জন্য শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব নিজের প্রাণ বাজি রেখে। এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো চোখে চোখে।

লিটন ও সাহেদ চলে গেল যার যার বাড়িতে। রাত হলো। রোকেয়া বেগম জেগে আছেন। শিমুলও খরগোশের কানের মতো কান খাড়া করে শুয়ে আছে। তার চোখেও ঘুম নেই আজ। কখন তারা আসবে, সেই প্রতীক্ষায় মা-ছেলের দুই জোড়া নয়ন।

খটখট আওয়াজে রোকেয়া বেগমের ঘুম ভেঙে গেল। কখন যে চোখের পাতা এক হয়ে গেছে টের-ই পাননি। তিনি কিছু বুঝে উঠার আগেই শিমুল দরজা খুলে দিলো। রোকেয়া বেগম ছেলের উত্তেজনা ও ব্যগ্রতা দেখে একটা ঠান্ডা নিশ্বাস ছাড়লেন। তাহলে শিমুল ঘুমায়নি! ছেলের এমন দেশপ্রেম দেখে এক চিলতে হাসি ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল।

শিমুল পাতিলে থাকা ভাত ও মুরগির ডিম এগিয়ে দিলো তাদের। প্লেট, পানি সব এগিয়ে দিলো সে। শিমুল কী করবে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

শিমুল থতোমতো খেয়ে বলল, তোমরা আসবে বলে মা আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ভাবি শিমুলের আজ কী হইছে? রফিক হাসতে হাসতে বলল।

রোকেয়া বেগম কাপড়ের দুটি গাঁটরি দেখিয়ে বললেন,

শিমুল ও তার দুই বন্ধু মিলে তোমাদের জন্য জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করেছে। যেন এই শীতে যুদ্ধ করতে তোমাদের কষ্ট না হয়। শুধু তাই না। তারা তিন বন্ধু তোমাদের জন্য কিছু শুকনো খাবারও সংগ্রহ করেছে।

রফিকরা অবাক হয়ে গেল। এত কাপড়! খাবার। শিমুলকে কাছে টেনে বুকে নিলো রফিক। বলল, এত কাপড় তুমি কীভাবে জোগাড় করলে?

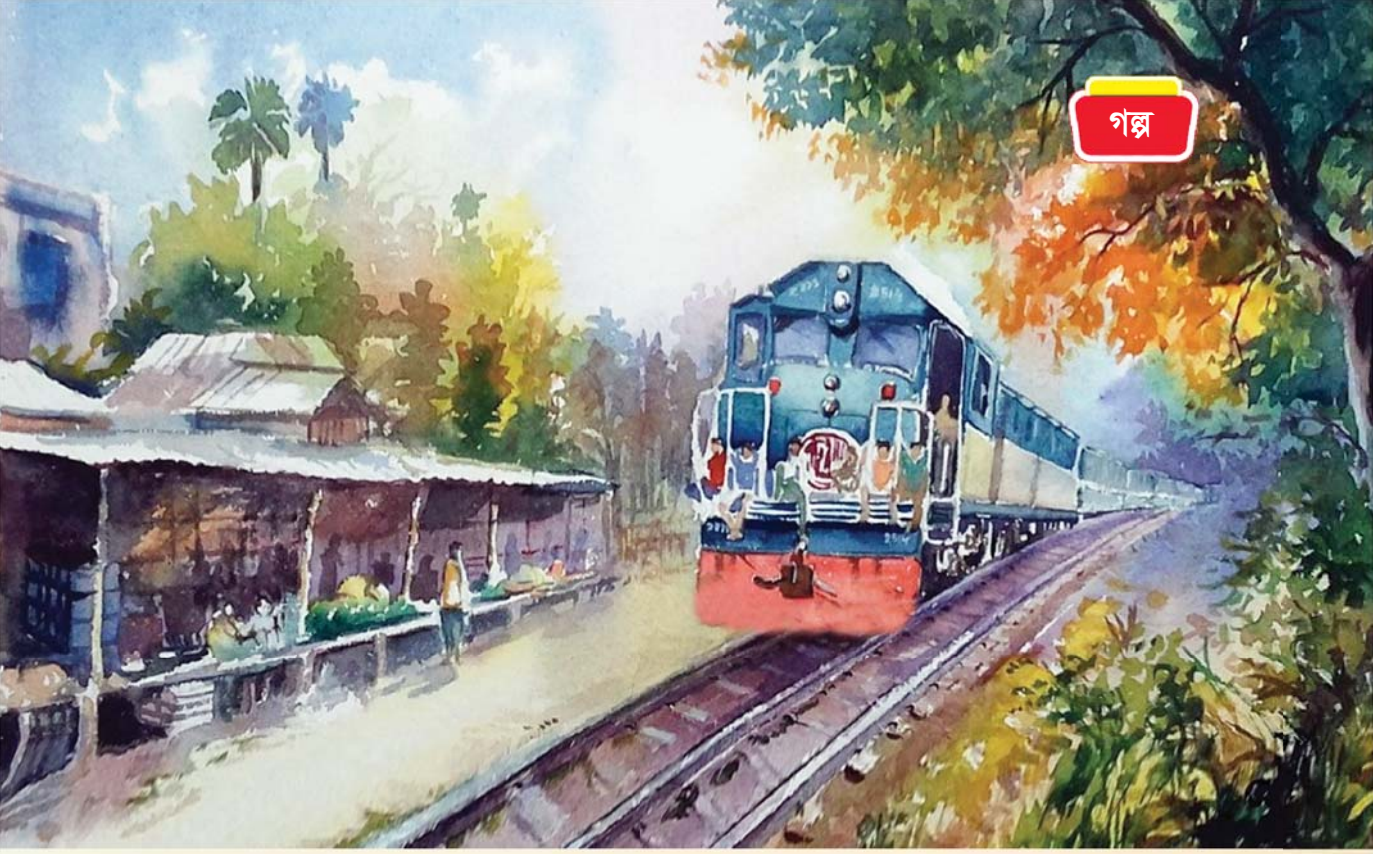
শিমুল সব বলল। সাহেদ ও লিটনকে নিয়ে কীভাবে ঘরবাড়ি থেকে জামাকাপড় জোগাড় করল।

সব শুনে রফিকসহ বাকিরাও হু হু করে কেঁদে দিলো। বলল, ছোটো হয়েও তোমরা যুদ্ধ করছ। যুদ্ধ করছ বস্ত্রের। বড়ো মুক্তিযোদ্ধা তো তোমরাই।

চার

শিমুল দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। হু হু করে শীতল বাতাস তার মুখাবয়বে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শিমুল শীতল বাতাস নাকেমুখে টেনে নিশ্বাস নিলো বুকের ভেতরে। মুহূর্তে তার হাত-পা শীতল হয়ে আসছে। শীতল হয়েছে ভেতরটাও। তবু শিমুল দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে। যাদের হাতেই হবে এই দেশ স্বাধীন। অন্ধকার গায়ে মেখে গাঁটরি দুটি এক কাঁধে আর অন্য কাঁধে বন্দুক নিয়ে চলছে তারা বিজয়ের লক্ষ্যে। ❑

শিশুসাহিত্যিক



পাগল বুড়ো

শাকিব হুসাইন

বনবিভাগে চাকরি করেন বাবা। বদলির চাকরি। এই চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরেছি। ভালোই লাগে আমার। তবে খারাপ লাগে যখন স্কুল বন্ধুদের ছেড়ে আসি। এই তো কিছুদিন আগে বাবা বদলি হয়েছেন হেমায়েতপুরে। সেখানে নাকি বিশাল বন। পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ের কথা শুনে আগের মতো আর গোমড়ামুখো হয়ে থাকলাম না। বেশ আনন্দই হচ্ছিল। পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবো। তাও আবার পাহাড়ের গায়ে থেকেই!

রাতের ট্রেনেই বাবার সঙ্গে রওনা দিলাম হেমায়েতপুরের উদ্দেশে। ট্রেন চলছে ঝনঝন ঝনঝন। বাইরে যেন জোনাকির হাট বসেছে। এই জ্বলছে-নিভছে। বাইরের গাছপালা, ক্ষেতের ফসল চাঁদের জোছনা মেখে খুব আনন্দ করছে। এসব দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। ঘুমের ঘোর ভাঙল বাবার ডাকে। বললেন, তৈরি হয়ে নাও, আমরা নামব।

স্টেশনে বাবার নতুন অফিস থেকে একজন এসেছেন আমাদের রিসিভ করতে। আমাদের ফুল দিয়ে তিনি জিপগাড়ির দিকে নিয়ে গেলেন। গাড়ি চলছে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে। কিছুক্ষণ পর আমরা পৌঁছে যাই কোয়ার্টারে।

পরদিনই বাবা স্থানীয় এক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন আমায়। নতুন ক্লাসে গিয়ে শ্রেণি শিক্ষকের একগাদা প্রশ্ন- এটি এখন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত স্কুল পরিবর্তন হয় আমার। সে যাক, প্রথম দিনেই তিনজন বন্ধু জুটিয়ে ফেললাম। ছুটির পর আমরা পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটছি। আমরা মানে মোহন, রাতুল, ঋতুরাজ আর আমি। কিছুদূর যেতেই একটা বটগাছ চোখে পড়ে। গাছের নিচে বসে আছেন এক বুড়ো লোক। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি আর গায়ে লাল-সবুজের পতাকা জড়ানো।

রাতুল, মোহন ও ঋতুরাজ চেঁচিয়ে ওঠে, পাগল বুড়ো, পাগল বুড়ো। বুড়ো লোকটা মাথা তুলে তাকালো। শীর্ণ মুখটা দেখে আমার খুব মায়া হলো। রাতুলরা অবিরাম পাগল বুড়ো বলতেই থাকল।



লোকটা উঠে দাঁড়াতেই রাতুল বলে, পালাও, পালাও। বাধ্য হয়ে পালাতে হলো আমাকেও।

পরদিন আমি আর স্কুলে গেলাম না। স্কুলে না গিয়ে গেলাম বটগাছের দিকে। কাছে গিয়ে একটা কাশি দিতেই লোকটা মাথা তুলে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ভয় লাগছে। তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম।

কাছে এসে লোকটা বলল, কে তুমি বাবা?

জিসান রহমান জিতু। সবাই জিতু ডাকে। আমি এখানে নতুন এসেছি। আমার বাবা এখানকার ফরেস্ট অফিসার।

আমাকে দেখে তুমি পালালে না কেন? ভয় করে না?

মোটেও না। আপনাকে দেখে আমার দাদুর কথা মনে পড়ে। তিনিও ছিলেন আপনার মতো দেখতে।

সবাই তো আমাকে দেখে পালায়। তোমার দাদুর নাম কী?

আব্দুর রহমান হাদি।

তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন? পুরো নাম বীর বাহাদুর আব্দুর রহমান হাদি?

হ্যাঁ। তবে আপনি কী করে জানলেন?

তোমার দাদু আর আমি যে একসঙ্গে একাত্তরে যুদ্ধ করেছি।

আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা?

হ্যাঁ। একাত্তরে ৫ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলাম। তোমার দাদু আর আমি কত পাক-বাহিনী মারার অপারেশন করেছি! এক অপারেশনে হাদির বাম হাতে আর আমার ডান পায়ে বুলেট লেগেছিল। আমি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম। তোমার দাদু বলল, হামিদ ভাই মনে সাহস রাখুন। আপনি একজন বীর। দেশের জন্য এমন বুলেট কিছুই নয়। তোমার দাদুর এমন কথায় মনের বল বেড়ে গিয়েছিল সেদিন।

তার মানে, দাদু আপনার গল্পই শোনাতো আমাকে।

তোমার দাদু কেমন আছে বাবা?

বছর তিনেক আগে মারা গেছেন আমার দাদু।

তোমার দাদু অনেক বড়ো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাই তো স্বয়ং কমান্ডার তোমার দাদুকে বীর বাহাদুর উপাধি দিয়েছিল।

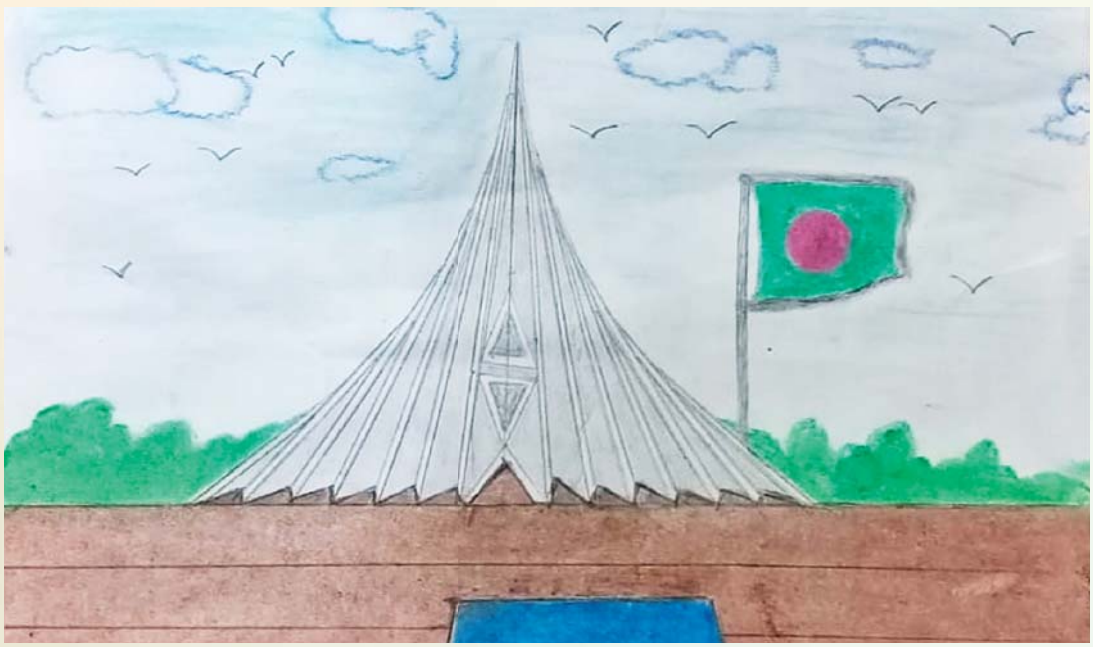
আপনিও অনেক বড়ো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন দাদু বলত। আচ্ছা, আপনি এখানে থাকেন কেন?

দেশ স্বাধীন হলে আমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসি। আমার তখন কেউ ছিল না। ওই যে কুঁড়েঘরটা দেখছ, ওখানে রাতে থাকি আর দিনে এখানে থাকি তোমার মতো বাচ্চাদের যুদ্ধের গল্প শোনাতে! কিন্তু আমার কাছে কেউ আসে না। সবাই পাগল বলে পালিয়ে যায়। পাগল বুড়ো মানে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে থাকে। আমারও চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। তাঁকে স্যালুট দিয়ে বাড়ি ফিরি।

কিছুদিন পর স্কুলে মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান চলছে। প্রধান অতিথি আমার বাবা। সপ্তম শ্রেণির পক্ষ থেকে আমাকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে বলা হলো। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে দিতে কখন যে বড়ো করে ফেলেছি মনেই নেই। বক্তব্যজুড়ে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদের গল্প। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। বক্তব্য শেষে বলি, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা এখানেই আছেন। দর্শক সারিতে বসা অভিভাবকসহ স্কুলের শিক্ষকরাও অবাক। আমি মাইকে কাঁদতে কাঁদতে বলি, বটগাছের নিচে যেই বুড়ো লোকটা বসে থাকেন তিনিই সেই মুক্তিযোদ্ধা। ঠিক তখনই মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ স্টেজের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। সবাই অবাক। আমি চিৎকার করে বলি, উনি পাগল নন। একজন মুক্তিযোদ্ধা। পাগল বুড়ো মাইক নিয়ে বলতে শুরু করলেন একাত্তরের গল্প। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। সবাই মনোযোগ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদের একাত্তরের গল্প শুনছে আর চোখের জল মুছতে থাকে। তারপর সবাই মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদকে একসঙ্গে স্যালুট করে। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদের চোখেও জল। আজ আর দুঃখের নয় আনন্দের জল। আকাশে তখন লাল-সবুজের পতাকা পতপত করে উড়ছে... ❑

শিশুসাহিত্যিক

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



সিয়াম, চতুর্থ শ্রেণি, দক্ষিণ-পূর্ব মাইটভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

কবিতাগুচ্ছ

শীতের আগমনি

বিপুল চন্দ্র রায়

প্রবল প্রতাপান্বিত শীতের আগমনি
অবিরাম অবসাদে মগ্ন ভুবন-জননী
হিমেল পরশে কাঁপে স্থাবর-জঙ্গম
সৌম্য কুয়াশা-জাল, নিবিড় নির্গম।

অধিত্যকা জুড়ে ঔদাসীন্যের খেলা
তুষার-শুভ্র শিশির, উত্তুঙ্গ বেলা
কৃশকায় বৃক্ষশাখে মন্থর বাতাস
মৌনব্রত ধরি যেন রহে দিগন্ত-আকাশ।

রুক্ষ প্রকৃতিতে জাগে মলিন আভা
তবুও উচ্ছ্বল হয় পৌষালি সভা
পায়েস-পিঠালি আর গুড়ের ঘ্রাণ
আত্মহারা উল্লাসে মাতে পল্লী প্রাণ।

শীতের পিঠা

এম. আবু বকর সিদ্দিক

অঘ্রাণ মাসে উঠান হাসে
সোনা বরণ ধানে,
চাষির মনে খুশির দোলা
নতুন ধানের ঘ্রাণে।

চাষি বধূ কুলা নেড়ে
উড়ায় ধানের চিটা,
নতুন ধানে তৈরি হবে
নানান স্বাদের পিঠা।

কাচিখোচা, পাটিসাপটা
আরো ভাপা-পুলি,
নারকেল-গুড়ের সিরা দিয়ে
মিষ্টি স্বাদের কুলি।

আতপ চাল আর খেজুর রসে
মজার পায়েস হবে,
গাঁয়ের সবাই উঠব মেতে
নবান্নের উৎসবে।

শীতের ঐতিহ্য

মোহাম্মদ আতিক হেলাল

শীত এলেই পিঠার উৎসব,
চারপাশে আনন্দের সয়লাব।
চুলোর পাশে গল্প জমে,
মায়ের হাতে পিঠা নামে।

ভোরের কুয়াশা নেমে আসে
সাদা চাদরে গ্রাম ভাসে
ঘাসের ডগায় শিশির ঝরে
সূর্যের আলোয় চিকচিক করে।

সকালবেলা রসের হাঁড়ি
খেজুর গাছে ঝোলে ভারী
শীতের রোদ মিষ্টি লাগে
পিঠার সাথে গল্প জাগে।



গ্রাম-বাংলার শীত

নাজিম উদ্দিন

শীত এলে পুকুর ধারে
রোদ লাগায় সবাই গায়ে
করে সবাই গল্পের শুরু
সাথে থাকে পিঠা, নাড়ু।

কুয়াশার চাদর জড়িয়ে
সন্ধ্যা নামে অন্ধকার ছড়িয়ে
সকাল শুরু সোনালি রোদে
মজে সবাই পায়েসের স্বাদে।

রোদের ছোঁয়ায় কুয়াশা সরে
নতুন দিনের গল্প পড়ে
এই সকালেই প্রাণ জুড়ায়
বাংলার শীত হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

দশম শ্রেণি, দেবিদ্বার সরকারি রেয়াজ উদ্দিন পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

শীত

মাহবুবুর রহমান শিশির

গ্রাম-বাংলায় শীত নামে চুপিসারে
ধানক্ষেত কুয়াশায় ঢেকে পড়ে
খড়ের গাদায় চলে রোদের গান
পুরোনো স্মৃতিতে হয় অম্লান।

পুকুর পাড়ে হাঁসের সারি
নিরব দুপুর লাগে ভারি
মাটির ঘরে আগুন জ্বলে
শীতের গপ্পে হৃদয় গলে।

শাল-চাদরে ঢাকে শরীর
শীতল হাওয়া হয় স্থির
শীতেই গ্রাম হয় আপন
মাটির গন্ধে মিশে যায় জীবন।

একাদশ শ্রেণি, নরসিংদী সরকারি কলেজ, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী

শীতের রস

পিয়াস আহমেদ

খেজুর গাছের হাঁড়িগুলো দিনরাত ঝুলে
খেজুর গাছের যত্ন বাড়ে কনকনে শীত এলে
উঁচু গাছের হাঁড়িগুলো রসে ভর্তি হলে
নিয়ে যায় ভোররাতে শীত ভুলে।

শীতের খেজুরের রস হয় স্বাদে ভরপুর
খেজুর রসেই হয় বিখ্যাত গুড়
চিটাগুড়ে পিঠা হয় কাঁচা রসে ভরে হাঁড়ি,
তার জন্য সবাই করে অপেক্ষা বাড়ি।

বেশি শীতে বেশি রস আরো ভালো মান
মানুষের জন্য খেজুরের রস খোদার দান
ঘন কুয়াশা ভেদ করে উঠে সোনালি রবি
এটাই বাংলার চিরায়ত ছবি।

দ্বিতীয় বর্ষ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল





আমাদের আত্মীয়

নুরুল ইসলাম বাবুল

আমাদের দেশে শীতকাল এলেই চোখে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি। আমরা এদের অতিথি পাখি বা শীতের পাখি হিসেবে চিনে থাকি। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের শীতপ্রধান এলাকা থেকে এই পাখিগুলো আসে নিজেদের প্রয়োজনেই। সাইবেরিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া, চীন, তিব্বতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসে এরা। ওই সব দেশগুলোতে যখন শীতের তীব্রতা ভীষণ রকম বৃদ্ধি পায় তখন চারিদিক ঢেকে যায় সাদা বরফের স্তূপে। গাছপালা পর্যন্ত ছেয়ে যায়। গাছের পাতা ঝরে পড়ে। তখন পাখিরা হয়ে পড়ে আশ্রয়হীন। শুধু তাই নয়, খাদ্যের অভাবে ওদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। প্রজননের প্রতিকূলতাও দেখা দেয়। ফলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কিংবা বংশবিস্তারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে এইসব পাখি ঝাঁক বেঁধে আসতে থাকে অল্প শীতপ্রধান দেশগুলোয়। পৃথিবীতে অসংখ্য প্রজাতির পরিযায়ী পাখি রয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে ১০ ও ১১ই মে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করা হয়।

অতিথি পাখি বাংলাদেশে আসতে কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দেয় ডানায় ভর করে। সাধারণত নভেম্বর থেকেই আসতে শুরু করে পরিযায়ী পাখিগুলো। আর অবস্থান করে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। এই পুরো সময়জুড়ে পাখিগুলো সুন্দরবন এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা, হাওর-বাঁওড়, বিল-ঝিল ও অন্যান্য জলাশয়গুলোতে অবস্থান করে। এই সময়কালে তারা ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটায়। সময় হলে সেই বাচ্চাসহ আবার নিজ দেশে ফিরে যায়। এখানে মজার ব্যাপার হলো, পরিযায়ী পাখি যেখান থেকে আসে, ফেরার সময় হলে ঠিক সেখানেই ফিরে যায়। ফিরে গিয়ে ঠিক আপন বাসাটি খুঁজে নেয়। আবার বাংলাদেশের যে স্থানে আশ্রয় নিয়ে খাবার সংগ্রহ, বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল পরের বছর ঠিক সেই স্থানে অতিথি হয়ে ফিরে আসে।



এ ব্যাপারে তারা কখনো পথ ভুল করে না। তবে দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দেশে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে জলাশয় ভরাট, বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়ায় অতিথি পাখিগুলো হারিয়ে ফেলছে তাদের চেনা আশ্রয়। পরের বছর ফিরে এসে যখন তারা দেখতে পায় সেই চেনা জলাশয় আর নেই, সেই বনভূমি হারিয়ে গেছে তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে ওরা। এভাবে প্রতি বছর চেনা আশ্রয় হারিয়ে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা। এই পাখিগুলো নির্দিষ্ট সময়ে নিজেদের প্রয়োজনে এলেও আমাদের জন্য তা আশীর্বাদ স্বরূপ। অতিথি পাখির আগমনে একদিকে যেমন কলকাকলিতে আর অপরূপ সৌন্দর্যে ভরে ওঠে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, ঠিক তেমনি এরা ফসলের ক্ষেতের পোকামাকড় খেয়ে ফসলের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও এগুলোর বিষ্ঠা জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে বহুগুণে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিযায়ী পাখির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রং-বেরঙের অতিথি পাখির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে আর ওদের কিচিরমিচির ডাক শুনতে অসংখ্য পাখিপ্রেমিক বা পর্যটকগণ এই সময়টিতে ভিড় করে দেশের এইসব বনাঞ্চল, উপকূল, হাওর-বাঁওড়, বিল-ঝিল ও জলাশয়গুলোতে। কিন্তু কিছু অসাধু পাখি ব্যবসায়ী এবং লোকজনের হাতে নির্বিচারে চলে পাখি নিধনের মহোৎসব। অন্যদিকে আমাদের বনাঞ্চল উজাড় ও জলাশয় ভরাটের ফলে নিরাপত্তার অভাব চরম আকার ধারণ করেছে। তবে অতিথি পাখির আবাসস্থল নিরাপদ ও বিচরণস্থলকে সংরক্ষণ করতে কিছু জলাশয়ে গড়ে তোলা হয়েছে অভয়ারণ্য। দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনও বলবৎ রয়েছে। এ বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। সেইসাথে শক্ত নজরদারি ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরিবেশ রক্ষাকারী অতিথি পাখি খুঁজে পাবে নিরাপদ আশ্রয়। তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কেননা অতিথি পাখি আমাদের উপকারী আত্মীয়। ❑

সহকারী শিক্ষক, বিলচান্দক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা



গল্প

সবুজ পৃথিবী

নূহু আব্দুল্লাহ

সূর্বের বয়স আট। সে আর তার বাবা-মা, বোন যে উপজেলা শহরটিতে বাস করে তার পাশ দিয়ে একটি ছোটো খাল বয়ে গেছে। খালটি সূর্বদের পাড়া থেকে একটু দূরে। ওই খালের ধারে মাঠ আছে একটা। বকুলতলার মাঠ। এই মাঠটা সূর্বের খুব প্রিয়। প্রতি বিকালে নিজের পাড়ার দুজন বন্ধুর সঙ্গে সে খেলতে যায় তার প্রিয় বকুলতলা মাঠে।

ছোটোখাটো উপজেলা শহরগুলোতেও এখন বেশ ঘনবসতি। একেকটা শহরে এ বসতি গড়ে উঠেছে পাড়ায় পাড়ায় ভাগ হয়ে। মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য বাজারও গড়ে উঠেছে কয়েক জায়গায়। রাস্তার ধার দিয়ে কেবল দোকান আর দোকান। এত মানুষ যে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া কঠিন হয়ে





গেছে মফস্বলেও। রাস্তায় মোড়ে মোড়ে জ্যাম লেগে থাকে। দোকানের সামনে রাস্তায়, ফুটপাতে পড়ে থাকে পলিথিন, চিপসের প্যাকেট।

একদিকে মানুষ যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে জমি যাচ্ছে কমে। ঠাসাঠাসি করে বসতি গড়ে ওঠায় সূর্বদের শহরটিতে এখন বাচ্চাদের খেলার জন্য মাঠের সংখ্যাও কম। একটা উপজেলা শহরের এত বাচ্চার খেলার জন্য মাত্র দুইটা মাঠ রয়েছে। তাও সেগুলোর মধ্যে কোনোটাতে ঠিকমতো ঘাস নেই। যে কারণে খেলতে গিয়ে হাতে পায়ে ব্যথা লাগে। কখনও কখনও তো শক্ত মাটির ঘষায় হাত-পায়ের চামড়া ছিলে যায়।

মাঠের এমন অবস্থা হওয়ার কারণ হলো, এখানে কেবল খেলা হয় না, প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত বসে গরু-ছাগলের হাট। সন্ধ্যায় বসে ফুচকাওয়ালা, চটপটিওয়ালার দোকান। আর প্রতি সন্ধ্যায় বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন করে দলবদ্ধভাবে বসে আড্ডা দেয় কিছু মানুষ। মাঠজুড়ে তাই নানা রকমের আবর্জনায় সয়লাব। একদিন তো ব্লেডের ভাঙা অংশও দেখেছে সূর্ব। না জানি অসচেতন মানুষগুলো আরও কত কি ফেলে যেখানে-সেখানে!

বকুলতলার মাঠে খেলার সময় এ অবস্থা দেখে খারাপ লাগলেও এক রকম অভ্যস্ত হয়ে গেছে সূর্ব। এসব নিয়ে তো তার কিছু করার নেই- সে যে ছোটো মানুষ- সবাই তাই বলে। এগুলো তাই সে মনের মধ্যে নেয় না।

কিন্তু আজ কয়েকদিন ধরে সূর্বের মনটা খুব খারাপ। আর এর কারণ হলো, মাঠের পাশ দিয়ে যে খালটি বয়ে গেছে, সেদিন খেলতে ইচ্ছে করছিল না তাই খালের ধারে হাঁটতে গিয়েছিল সে। গিয়ে দেখে ময়লা আর প্লাস্টিকের বোতলে খাল ভরে আছে। খালের ধারজুড়ে ঘাসের ওপর ঝকঝকে সবুজ রঙের বদলে চিপসের প্যাকেট আর পলিথিন পড়ে আছে। সূর্ব দেখল, একটি ছোটো শালিক পাখি খালের পাড়ে

পড়ে থাকা একটা প্লাস্টিকের সুতার জালে আটকে ছটফট করছে। সে দৌড়ে গিয়ে সাবধানে পাখিটাকে মুক্ত করল। পাখিটা ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে পাশের আমগাছে বসল। এ সময় সূর্বের মনে হলো, পাখিটা যেন করুণ চোখে তাকে বলছে, 'বন্ধু, আমাদের জায়গাটা কেন এমন নোংরা করে দিলে? তোমরা না মানুষ? তোমরা না শ্রেষ্ঠ জীব? আমরা তো মানুষ না, পাখি। আমরা তো শ্রেষ্ঠ জীব না। কিন্তু আমরাও কি তোমাদের জায়গা এভাবে নষ্ট করি?'

সূর্বের খুব খারাপ লাগল। সে তখনই সেখান থেকে দৌড় দিল। এক দৌড়ে সে গেল তার বন্ধুদের কাছে। সন্ধ্যার আগেই তার বন্ধু সুরভী, নোমান আর রাফিদকে নিয়ে একটা মিটিং করল। সে বলল, 'আমাদের খেলার মাঠ আর ওই খালটাকে বাঁচাতে হবে। বড়োরা তো খেয়াল করছে না, চলো আমরাই কিছু করি।'

পরদিন শুক্রবার। স্কুল ছুটি। সবাই মিলে বাড়ি থেকে গ্লাভস, বড়ো ঝুড়ি আর কোদাল নিয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিতে লাগল। সূর্বের বাবা-মা তার কাছে জানতে চাইল সে কী করতে যাচ্ছে। সূর্ব তার বাবা-মাকে সব বলল।

সে কথা শুনে মা বললেন, 'দাঁড়াও, আমি শরবত বানিয়ে দিচ্ছি, ঘরে বানানো কিছু কেকও আছে। তোমার জন্য আর তোমার বন্ধুদের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাও। কাজ করতে করতে তৃষ্ণা লাগবে, ক্ষুধা লাগবে। তখন খেও।'

বাবা আনলেন নিম, বকুল আর কৃষ্ণচূড়ার ১০টি চারাগাছ। বললেন, 'এগুলো মাঠের চারপাশে আর খালের ধারে যদি জায়গা থাকে, লাগিয়ে দেবো। আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে, চলো।'

সূর্ব আর তার বন্ধুরা সারা সকাল ধরে মাঠের সব চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিকের বোতল আর খালপাড়ের ময়লাগুলো পরিষ্কার করল। সেগুলো কুড়িয়ে বড়ো বস্তায় ভরল। এরপর তারা সবাই মিলে মাঠের চারপাশে বাবার আনা গাছগুলো লাগালো।

ছোটোরা কাজ করছে দেখে পাড়ার বড়োদের কয়েকজন এগিয়ে এলেন। প্রতিবেশী হাশেম চাচা এসে বললেন, 'তোমরা আমাদের চোখ খুলে দিলে বাবা। আমরা বড়োরা তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে এই পৃথিবীটা তোমাদের।' তিনি মাঠে একটি বড়ো ডাস্টবিন বসিয়ে দিলেন এবং সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা, 'যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা নিষেধ'।

এরপর এলাকাবাসী স্থানীয় পৌরসভায় আবেদন করে মাঠটায় হাট বসানো বাতিল করল। সন্ধ্যায় কারো মাঠের ভিতরে বসতে কোনো নিষেধ নেই, তবে কেউ যেন সেখানে ময়লা না ফেলে সেজন্য আরেকটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হলো। কোনো ফুচকাওয়ালা কিংবা চটপটিওয়ালা মাঠের ভিতরে ঢুকতে পারবে না। বাইরের দিকে দাঁড়াতে পারবে কিন্তু কোনো চিপসের প্যাকেট কিংবা পলিথিন মাঠের মধ্যে কিংবা এদিক-সেদিক ফেলতে পারবে না, ডাস্টবিনের ভিতরে ফেলবে। এসব কথা বলে দেওয়া হলো তাদের।

কয়েক মাস কেটে গেল। এখন আর বকুলতলা মাঠে ময়লা নেই। সেই ছোটো চারাগাছগুলো এখন সূর্বের চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে। মাঠে ঘন ঘাস জন্মেছে। বৃষ্টির দিনে মাঠটা ঘন সবুজ দেখায়। সেই শালিক পাখিটি এখন তার সঙ্গীদের নিয়ে রোজ বিকেলে আসে। কত ফড়িং আর প্রজাপতি ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় সানন্দে। খালে বাধাহীন বয়ে যায় পানির ধারা।

সূর্ব এখন মাঠে খেলতে গিয়ে যখন বুক ভরে নিশ্বাস নেয়, তখন তার খুব গর্ব হয়, আনন্দ হয়। সে বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীটাকে সুন্দর রাখতে হলে খুব বড়ো বড়ো কাজ করতে হয় না; নিজের চারপাশটা পরিষ্কার রাখা আর একটা করে গাছ লাগানোই যথেষ্ট।

সেদিন বাবাকে কথাটা বলতেই বাবা বললেন, 'আমরা যে মানুষ, আমাদের অনেক দায়িত্ব। আমাদের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বটাও আমাদেরই। ছোটো ছোটো সচেতনতাই পারে এই পৃথিবীকে আবার সবুজ ও সুন্দর করে তুলতে।' ❑

প্রাবন্ধিক



আগামীর বাংলাদেশ

ইকবাল খান

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এই স্বাধীনতা আমরা হঠাৎ করে পাইনি। লাখো শহিদের রক্ত, অসংখ্য মায়ের চোখের জল আর মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। স্বাধীনতা লাভের বহু বছর পেরিয়ে গেছে। সময় থেমে নেই, পৃথিবী বদলেছে, মানুষ বদলেছে। আজকের কিশোররাই আগামী দিনের বাংলাদেশ। তাদের চিন্তা, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও স্বপ্নের ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ পথচলা।

আমরা এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে প্রতিটি কিশোর সমান শিক্ষার সুযোগ পাবে। গ্রাম বা শহর- এই বিভাজন যেন শিক্ষার পথে বাধা না হয়। একটি গ্রামের স্কুলের শিক্ষার্থী যেন মনে না করে সে পিছিয়ে আছে। শিক্ষা হবে মানুষ হওয়ার শিক্ষা। নৈতিকতার শিক্ষা। দায়িত্ববোধের শিক্ষা। শিক্ষা যেন হতে পারে জীবন বদলের হাতিয়ার। শিক্ষার মানে যেন হয় শৃঙ্খলা ও মানুষ হওয়া। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে কিশোররা শিখবে। পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না।

একজন কিশোর যদি সৎভাবে চেষ্টা করে, যদি সে বারবার পড়ে যায় কিন্তু উঠে দাঁড়ায়, তবে রাষ্ট্র ও সমাজ তাকে সহায়তা করবে। আমরা চাই প্রতিভার পাশাপাশি অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি। খেলাধুলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য-সব ক্ষেত্রে সুযোগ। ব্যর্থতাকে অপমান নয়, শেখার ধাপ হিসেবে দেখা। নিয়মিত চেষ্টা অনেক দরকারি। একটি দেশের উন্নতি শুধু উঁচু ভবনে নয়, উন্নতি বোঝা যায় মানুষের আচরণে।

আমরা এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে কিশোররা বড়োদের সম্মান করবে। ছোটোদের ভালোবাসবে। নারী-পুরুষ সবাইকে সমান চোখে দেখা হবে। শিষ্টাচার মানে শুধু ভদ্র কথা নয়। শিষ্টাচার মানে লাইনে দাঁড়ানো, ট্রাফিক আইন মানা, অন্যের মতকে সম্মান করা। আমাদের দেশের কিশোরদের হৃদয় আছে–এবার দরকার চর্চা।

আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে কিশোররা শিখবে- সততাই সবচেয়ে বড়ো শক্তি। পরীক্ষায় নকল না করা, মিথ্যা না বলা, অন্যের অধিকার নষ্ট না করা, এসব হবে স্বাভাবিক আচরণ। কিশোররা যেন দেখে- সৎ মানুষ অবহেলিত হয় না, বরং সম্মান পায়।

আমরা এমন বাংলাদেশ চাই– যেখানে কিশোররা ভয় নয়, স্বপ্ন নিয়ে বড়ো হবে। স্কুলে বুলিং থাকবে না। রাস্তায় চলাফেরা নিরাপদ হবে। অনলাইনে হয়রানি কমবে। কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। তাদের কথা শোনা দরকার, বোঝা দরকার। একটি দেশ তখনই এগোয়, যখন সে তার কিশোরদের কাঁদতে নয়, হাসতে শেখায়।

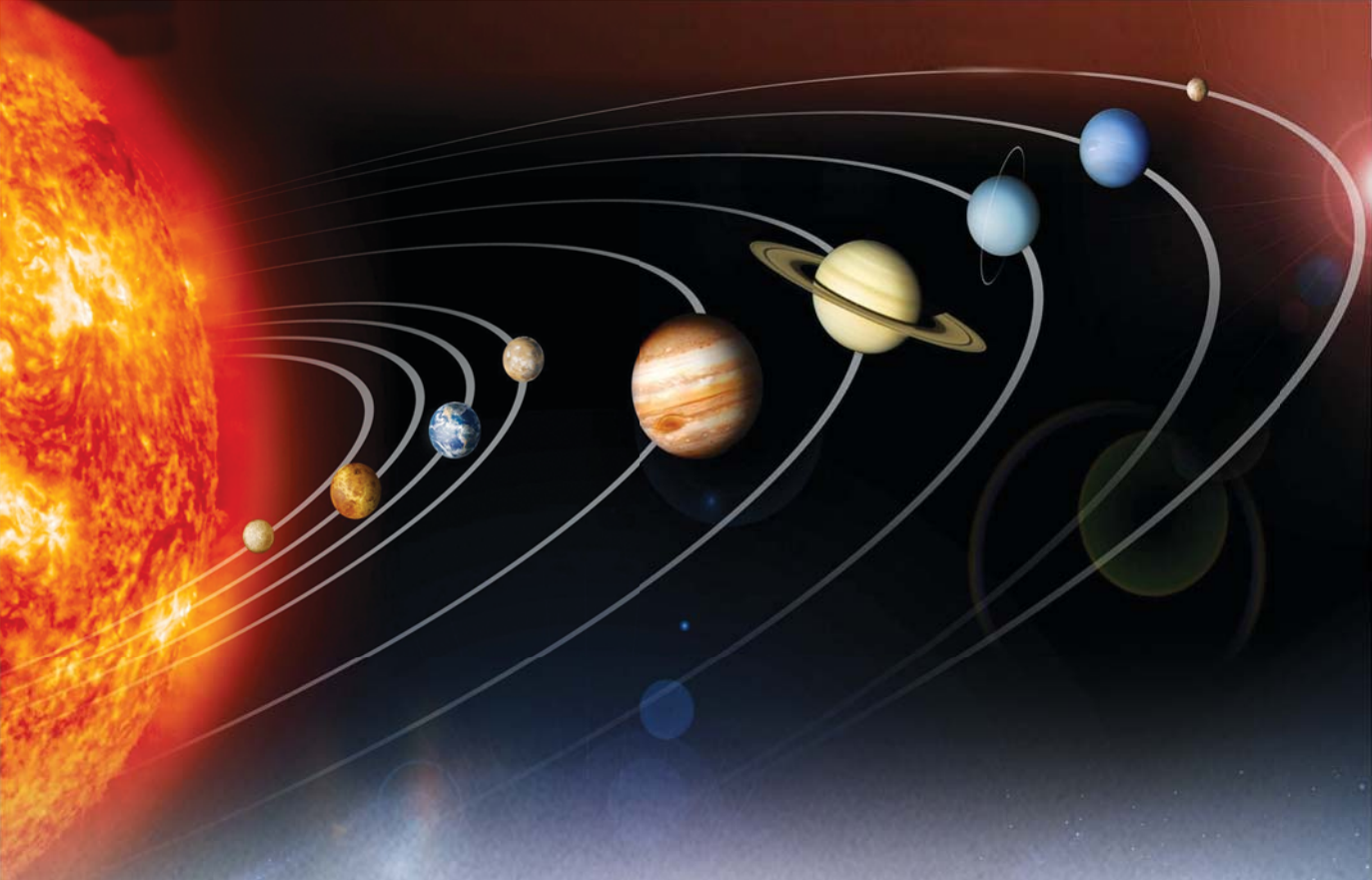
আমরা এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে কিশোররা বড়দের সম্মান করবে। ছোটদের ভালোবাসবে। নারী-পুরুষ সবাইকে সমান চোখে দেখবে। শিষ্টাচার মানে শুধু ভদ্র কথা নয়। শিষ্টাচার মানে লাইনে দাঁড়ানো, ট্রাফিক আইন মানা, অন্যের মতকে সম্মান করা।

পৃথিবী এখন প্রযুক্তিনির্ভর। আমাদের কিশোরদেরও প্রযুক্তিতে আরো দক্ষ হতে হবে। কিন্তু আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না- যেখানে প্রযুক্তি মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। আমরা চাই- প্রযুক্তির ব্যবহার হবে সৃজনশীল। সোশ্যাল মিডিয়া হবে দায়িত্বশীল আর বিজ্ঞান হবে মানবকল্যাণের।

স্বাধীনতার প্রকৃত মানে তখনই পূর্ণ হয়, যখন একজন কিশোর নিজের স্বপ্ন দেখার সাহস পায়। আমরা চাই–কেউ ডাক্তার হতে চাইলে সুযোগ পাবে। কেউ কবি, খেলোয়াড়, কারিগর হতে চাইলে সম্মান পাবে। পেশার কোনো লজ্জা থাকবে না। যোগ্যতা ও সততা হবে একমাত্র মানদণ্ড। কিশোরদের শুধু অধিকার নয়, দায়িত্বও শেখাতে হবে। পরিবেশ রক্ষা, আইন মানা, সমাজের দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো, এসব শেখানো দরকার স্কুল থেকেই।

স্বাধীনতা লাভের বহু বছর পেরিয়ে গেছে। এখন স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার সময়। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে কিশোররা শুধু চাকরি খোঁজার মানুষ নয়, বরং মানুষ গড়ার কারিগর হবে। শিক্ষা, অধ্যবসায়, নৈতিকতা, সততা ও মানবিকতা- এই পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের কিশোরদের জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। আজকের কিশোরই আগামীর বাংলাদেশ। তাদের জন্য দেশ গড়াই আমাদের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব। ❑

প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা



সূর্যের পরিবারের মজার তথ্য

আসিফ মেহ্‌দী

রাতে আকাশের দিকে তাকালে তোমরা দেখতে পাও চাঁদ এবং অসংখ্য উজ্জ্বল বিন্দু। এই উজ্জ্বল বিন্দুগুলোর সবই তারা (star) নয়। এর মধ্যে কিছু হলো গ্রহ (planet)। তারার নিজস্ব আলো আছে, কিন্তু গ্রহের নিজের আলো নেই। গ্রহগুলো তারা থেকে আসা আলো প্রতিফলিত করে (reflect) বলে আমরা জ্বলজ্বল করতে দেখি। সূর্য ও সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি নিয়ে যে পরিবার, তাকে বলা হয় সৌরজগত (solar system)। সৌরজগতের সদস্যদের সুশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে থাকার মূল কারণ একটি শক্তি, তার নাম মহাকর্ষ (gravitation)। এই মহাকর্ষ বলের (gravitational force) প্রভাবে গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে নির্দিষ্ট পথে ঘোরে, সেই পথকে বলা হয় কক্ষপথ (orbit)। তাই সৌরজগতকে তুমি চাইলে একটি পরিবার বলতে পারো, যার কেন্দ্রে একজন, আর তার চারদিকে নিয়ম মেনে ঘুরে চলা নানা বয়সি, নানা স্বভাবের সদস্য।

সূর্য আমাদের আপন নক্ষত্র বা তারা। সূর্যের ভেতরে মূলত ঘটে নিউক্লীয় সংযোজন (nuclear fusion) বিক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিয়ে হিলিয়াম তৈরি হয়, আর বেরিয়ে আসে বিপুল শক্তি। এই শক্তি আলো, তাপ এবং নানা ধরনের বিকিরণ (radiation) হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জীবের খাদ্যচক্রের ভিত্তি এবং অক্সিজেন উৎপাদনে সাহায্য করে সবুজ পাতার যে সালোকসংশ্লেষণ (photosynthesis) প্রক্রিয়া, তাতে ব্যবহৃত হয় সূর্যের আলো। যদি সূর্য না থাকত, পৃথিবীতে দিনরাত, ঋতুচক্র, এমনকি জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ থাকত না। সূর্যের মহাকর্ষ তার পরিবারের

গ্রহগুলোকে টেনে ধরে রেখে পুরো সৌরজগতের ছন্দ ঠিক রাখে। সূর্যের চারপাশে সুনির্দিষ্ট নিয়মে গ্রহরা ঘোরে; এটি গতি (motion) আর মহাকর্ষের ভারসাম্যের ফল। গতি গ্রহকে সামনে ঠেলে দেয়, আর মহাকর্ষ তাকে ভেতরে টানে, দুই মিলেই তৈরি হয় স্থিতিশীল কক্ষপথ (orbit)।

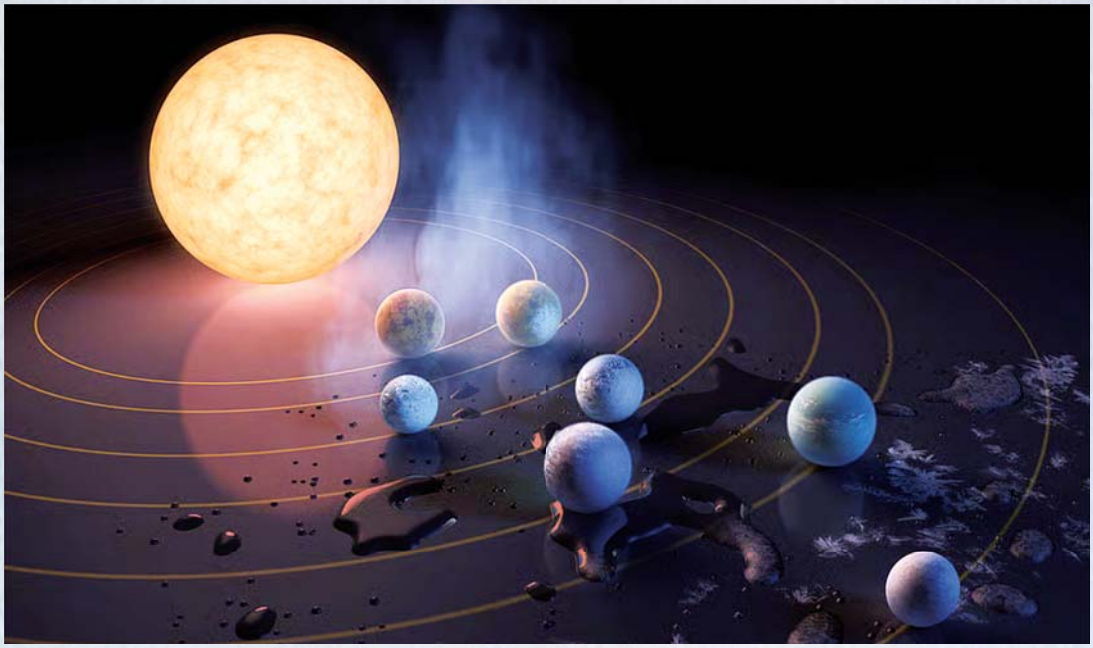
সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ (Mercury), তারপর শুক্র (Venus)। এ দুটিই স্থলগ্রহ (terrestrial planet), অর্থাৎ পাথুরে বা শিলাময়। বুধ গ্রহের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত পাতলা, তাই তাপ ধরে রাখার মতো কম্বল নেই। ফলে বুধে দিনের বেলা তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায়, রাতে আবার খুব নেমে যায়। শুক্র গ্রহের চিত্র একেবারে উলটো। শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি; এতে শক্তিশালী গ্রিনহাউস প্রভাব (greenhouse effect) তৈরি হয় এবং তাপ আটকে যায়। তাই শুক্র সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ। এই তপ্ততা সূর্যের কাছে থাকার জন্য নয়, বরং বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যের জন্য। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হলেও সবচেয়ে গরম নয়। গরম না হলেও গ্রহ দুটোতে জীবন ধারণ সম্ভব নয়। এই দুই গ্রহ থেকে একটি বড়ো শিক্ষা পাওয়া যায়: সূর্যের কাছাকাছি থাকলেই জীবন সম্ভব হয় না; প্রয়োজন সঠিক তাপমাত্রা এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঠিক ভারসাম্য।

বুধ ও শুক্রের পর আমাদের পৃথিবী (Earth), একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবজগতের বাস। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হলো তরল পানি (liquid water) এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet radiation) থেকে সুরক্ষা দেয়, আবার তাপমাত্রাও সহনীয় সীমায় রাখতে সাহায্য করে। পৃথিবীর সঙ্গে আছে তার একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ: চাঁদ (Moon)। চাঁদ শুধু রাতের আকাশ সাজায় না; তার মহাকর্ষ সমুদ্রের জোয়ার-ভাটায় ভূমিকা রাখে, এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের ঢালকে (axial tilt) স্থির রাখতে সাহায্য করে। এই স্থিতিশীলতাই ঋতু (seasons) ও জলবায়ুর ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর পরে আছে মঙ্গল (Mars)। মঙ্গলগ্রহটিকে লালচে রঙের দেখায়। এর জন্য দায়ী এই গ্রহের পৃষ্ঠতলে ফেরিক অক্সাইড অর্থাৎ মরিচা ধরা ধুলার আধিক্য। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত পাতলা এবং প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইডে (carbon dioxide) গঠিত। ফলে সেখানে বায়ুচাপ (atmospheric pressure) পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। এই কম চাপের কারণে মঙ্গলে তরল পানি থাকা কঠিন। তবু মঙ্গলে বরফ আছে: মেরু অঞ্চলে (polar caps) এবং মাটির নিচে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, মঙ্গলে এমন ভূমিরূপ (landforms) পাওয়া গেছে, যা অতীতে পানি প্রবাহের ইঙ্গিত দেয়। তাই মঙ্গল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে: একসময় কি সেখানে পানির অস্তিত্ব ছিল? জীবন কি কখনো শুরু হতে পেরেছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে নানা মহাকাশযান মঙ্গলে গেছে, ছবি পাঠিয়েছে, মাটি বিশ্লেষণ করেছে। মানুষ ভবিষ্যতে মঙ্গলে বসতি গড়তে পারবে কি না, সেটা প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার ওপর নির্ভর করছে।

মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে গ্রহাণু বেল্ট (asteroid belt)। এখানে থাকা অসংখ্য গ্রহাণু সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। গ্রহাণু হলো ছোটো পাথুরে বস্তু, কিছু একেবারে পাহাড়ের মতো, কিছু আবার পুরো দ্বীপের মতো বিশাল হতে পারে। এদেরকে অসম্পূর্ণ গ্রহ বলা যায়, কারণ সৌরজগত গঠনের সময় এই অঞ্চলের উপাদানগুলো একত্র হয়ে বড়ো গ্রহ তৈরি করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতি গ্রহের শক্তিশালী মহাকর্ষ এই অঞ্চলের গ্রহাণুগুলোকে একসঙ্গে জমাট বাঁধতে বাধা দিয়েছে, ফলে তারা ছোটো ছোটো বস্তু হিসেবেই থেকে গেছে। গ্রহাণুগুলোর মধ্যে সৌরজগতের শুরুর দিনের উপাদান ও রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। কখনো বা কিছু গ্রহাণু কক্ষপথ বদলে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে, তখন পৃথিবীর নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

গ্রহাণু বেল্টের পর সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ: বৃহস্পতি (Jupiter)। বৃহস্পতি একটি গ্যাসীয় দৈত্য (gas giant), যার ভেতরে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। এই গ্রহের ভর এত বেশি যে তার মহাকর্ষ সৌরজগতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বৃহস্পতি অনেক গ্রহাণু ও ধূমকেতুকে নিজের দিকে



টেনে নেয় বা তাদের গতিপথ বদলে দেয়। ফলে, পৃথিবীর দিকে সরাসরি ধেয়ে আসা অনেক বস্তুই আটকে যায় বা অন্য দিকে সরে যায়। এ কারণে অনেক বিজ্ঞানী বৃহস্পতিকে সৌরজগতের প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ (natural shield) বলে থাকেন, যদিও এর ভূমিকা সব সময় একমুখী নয়। বৃহস্পতির চারপাশে রয়েছে অসংখ্য উপগ্রহ; এর মধ্যে ইউরোপা (Europa), গ্যানিমিড (Ganymede) ও ক্যালিস্টো (Callisto) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপার বরফের নিচে তরল পানির সমুদ্র থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা সৌরজগতে জীবনের সন্ধানের ক্ষেত্রে বড়ো প্রশ্ন তৈরি করেছে।

বৃহস্পতির পরে আছে শনি (Saturn)। এটি আরেকটি গ্যাসীয় দৈত্য, তবে তার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি তার বিশাল ও সুন্দর বলয়ের জন্য। শনির বলয় একটানা কোনো কঠিন চাকতি নয়; বরং অসংখ্য বরফ ও পাথরের কণা মিলিয়ে তৈরি। এই কণাগুলোর আকার ধূলিকণা থেকে শুরু করে বড়ো পাথর পর্যন্ত হতে পারে। শনির নিজস্ব উপগ্রহের সংখ্যাও অনেক এবং এর মধ্যে টাইটান (Titan) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টাইটানের ঘন বায়ুমণ্ডল আছে এবং সেখানে মিথেনের বৃষ্টি, নদী ও হ্রদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো উপগ্রহে বিরল।

সৌরজগতে শনির পর আরও দূরে আছে ইউরেনাস (Uranus) ও নেপচুন (Neptune)। এই দুই গ্রহকে বলা হয় বরফীয় দৈত্য (ice giant)। কারণ এদের ভেতরে পানি, অ্যামোনিয়া ও মিথেনের বরফের পরিমাণ বেশি। ইউরেনাসের সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো, এটি নিজের অক্ষের ওপর প্রায় পাশ ফিরে ঘোরে। ফলে ইউরেনাসে ঋতু পরিবর্তন অত্যন্ত চরম। নিজের এই অস্বাভাবিক হেলনের কারণে গ্রহটির কোনো অঞ্চলে প্রায় ৪২ বছর ধরে সূর্যের আলো পড়ে, আবার অন্য কোনো অঞ্চল প্রায় ৪২ বছর ধরে অন্ধকারে ঢাকা থাকে। নেপচুন সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ এবং সেখানে দেখা যায় সবচেয়ে দ্রুত বায়ুপ্রবাহ: ঘণ্টায় দুই হাজার কিলোমিটারেরও বেশি গতির ঝড়।

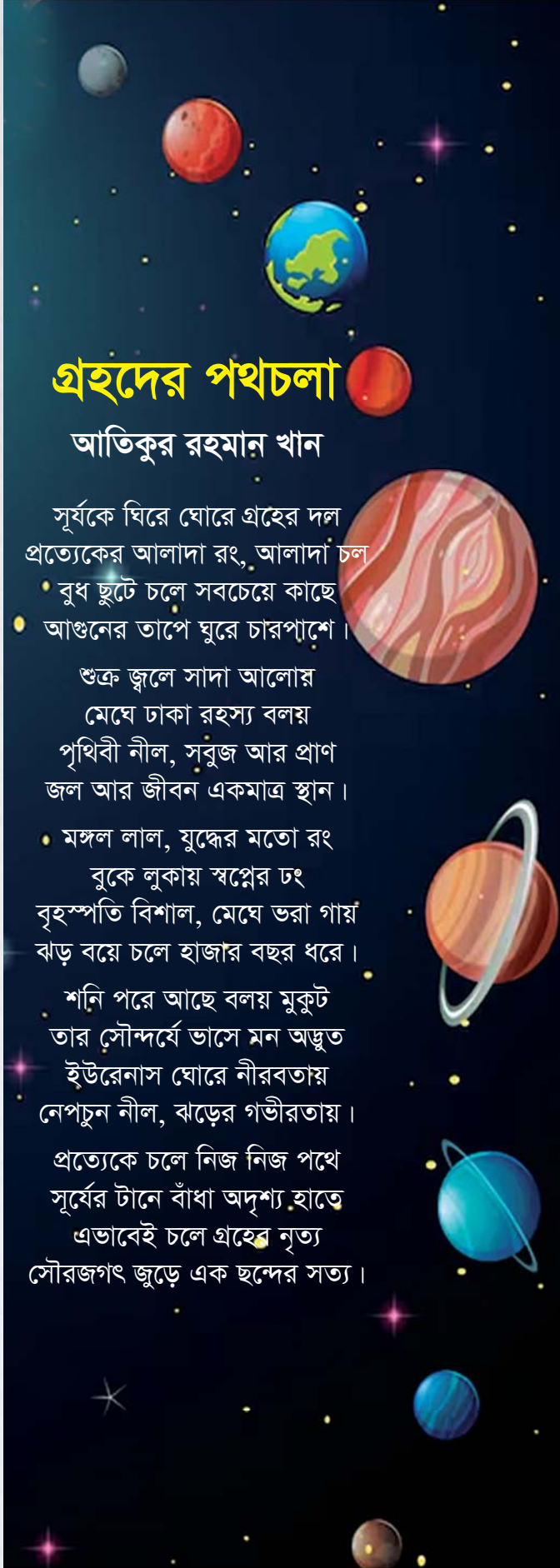
সূর্যের পরিবারে সব গ্রহের অবস্থান একরকম নয়, আর সব গোলাকার বস্তুকে পূর্ণ গ্রহ বলা হয় না। তাদের বলা হয় বামন গ্রহ (dwarf planet)। প্লুটো (Pluto), সেরেস (Ceres), এরিস (Eris), হাউমেয়া (Haumea) ও মাকেমাকে (Makemake) এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান

সংস্থা (International Astronomical Union, IAU) অনুযায়ী, পূর্ণ গ্রহ হতে হলে কোনো বস্তুকে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে হবে, প্রায় গোলাকার হতে হবে এবং নিজের কক্ষপথের আশপাশ পরিষ্কার করতে সক্ষম হতে হবে। প্লুটো শেষ শর্তটি পূরণ করতে না পারায় তাকে বামন গ্রহ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

সৌরজগতে আরও কিছু সদস্য আছে যারা পূর্ণ গ্রহ, বামন গ্রহ, উপগ্রহ বা গ্রহাণু নয়। যেমন: ধূমকেতু (comet) মূলত বরফ, ধুলা ও পাথুরে কণার সমন্বয়ে গঠিত। এরা সাধারণত সৌরজগতের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসে। সূর্যের কাছে এলে ধূমকেতুর বরফ গলে গ্যাস ও ধুলা বেরিয়ে আসে এবং সূর্যের বিপরীত দিকে লম্বা লেজের মতো আকার ধারণ করে। আবার, উল্কা (meteor) হলো ছোটো পাথুরে বস্তু যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে, আর যদি এর কোনো অংশ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়, তাকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড (meteorite)। এসব বস্তু সৌরজগতের গতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বোঝায় এবং একই সঙ্গে সৌরজগতের জন্মের সময়কার উপাদান বহন করে, যা মহাকাশ গবেষণার জন্য অমূল্য তথ্যের উৎস।

সৌরজগতের এই পুরো পরিবার নিয়মের মধ্যে চলতে থাকে সময়ের হিসাব মেনে। একটি গ্রহ নিজের অক্ষের ওপর ঘুরতে যে সময় নেয়, সেটিই তার দিন; সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে যে সময় লাগে, সেটাই তার বছর। গ্রহের অক্ষের ঢাল (axial tilt) থেকে জন্ম নেয় ঋতু। এই নিয়মিত গতি ও শৃঙ্খলাই সৌরজগতকে স্থিতিশীল রাখে এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে। তবু সৌরজগত সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি জানা হয়নি। নতুন পর্যবেক্ষণ, নতুন প্রশ্ন এবং মহাকাশযান করে নতুন নতুন অভিযান প্রতিনিয়ত আমাদের ধারণা বদলাচ্ছে। এই লেখাটি তাই কেবল অতীত বা বর্তমানের গল্প নয়, এটা ভবিষ্যতের গবেষণার দিকে তাকিয়ে থাকা এক চলমান বৈজ্ঞানিক অভিযান, যেখানে তোমাদের কৌতূহলই হতে পারে পরবর্তী আবিষ্কারের শুরু! ❐

কথাসাহিত্যিক ও প্রকৌশলী



গ্রহদের পথচলা

আতিকুর রহমান খান

সূর্যকে ঘিরে ঘোরে গ্রহের দল
প্রত্যেকের আলাদা রং, আলাদা চল
বুধ ছুটে চলে সবচেয়ে কাছে
আগুনের তাপে ঘুরে চারপাশে।

শুক্র জ্বলে সাদা আলোয়
মেঘে ঢাকা রহস্য বলয়
পৃথিবী নীল, সবুজ আর প্রাণ
জল আর জীবন একমাত্র স্থান।

মঙ্গল লাল, যুদ্ধের মতো রং
বুকে লুকায় স্বপ্নের ঢং
বৃহস্পতি বিশাল, মেঘে ভরা গায়
ঝড় বয়ে চলে হাজার বছর ধরে।

শনি পরে আছে বলয় মুকুট
তার সৌন্দর্যে ভাসে মন অদ্ভুত
ইউরেনাস ঘোরে নীরবতায়
নেপচুন নীল, ঝড়ের গভীরতায়।

প্রত্যেকে চলে নিজ নিজ পথে
সূর্যের টানে বাঁধা অদৃশ্য হাতে
এভাবেই চলে গ্রহের নৃত্য
সৌরজগৎ জুড়ে এক ছন্দের সত্য।

শীতকালে বেশি ঘুম পায় কেন

কামরুল ইসলাম



শীতের দিনে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে কার না ভালো লাগে। তাই তো শীতে অনেকেরই সকালে ঘুম ভাঙতে চায় না। বিছানা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়। স্কুল বা কাজে যেতে চোখ জড়িয়ে আসে। এটা কি শুধু আলস্য, নাকি এর পেছনে আছে শরীরের ভেতরের কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে , শীতে আমাদের শরীর সত্যিই বেশি ঘুম চাইতে পারে।

জার্মানির বিজ্ঞানীরা ঘুম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একটি মজার বিষয় লক্ষ করেছেন, যেমন- বার্লিনের সেন্ট হেডউইগ হাসপাতালের ক্লিনিক ফর স্লিপ অ্যান্ড ক্রোনোমেডিসিনে করা এক গবেষণায় দেখা যায়, মানুষ যদি অ্যালার্ম ছাড়া ঘুমায়, তাহলে শীতের অন্ধকার ও ঠান্ডা মাসগুলোতে তারা স্বাভাবিকভাবেই বেশি সময় ঘুমায়। অর্থাৎ শরীর নিজেই তখন বেশি বিশ্রাম নিতে চায়।

গবেষকদের মতে, এ কারণেই শীতকালে স্কুলের সময়সূচি বা অফিসের কাজের সময় একটু বদলানো হলে উপকার হতে পারে। সামান্য বেশি ঘুম মানুষকে কম ক্লান্ত করে। এতে বেশি মনোযোগ ও সুস্থ থাকা যায়।

কিন্তু কথা হলো, শীতেই কেন বেশি ঘুম দরকার হয়?

এ উত্তর পেতে আমাদের ঘুমের ভেতরের গঠনটা বুঝতে হবে। যেমন- ঘুমের দুটি প্রধান ধাপ আছে, নন-র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট বা এনরেম এবং র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট বা রেম। রেম ঘুম হলো সবচেয়ে গভীর ও আরামদায়ক ঘুমের স্তর। সাধারণত এই সময়েই আমরা স্বপ্ন দেখি, আর এ ঘুমেই মস্তিষ্ক সবচেয়ে বেশি বিশ্রাম পায়।

গবেষকরা বলেছেন, শীতকালে আমাদের শরীরে রেম ঘুমের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। আর এই অতিরিক্ত রেম ঘুম পাওয়ার জন্য মোট ঘুমের সময়ও একটু বাড়ানো দরকার হয়। না হলে শরীর প্রয়োজনীয় বিশ্রামটা ঠিকঠাক পায় না।

এ পরিবর্তনের মূল কারণ লুকিয়ে আছে আমাদের সার্কাডিয়ান রিদমে। যাকে সহজভাবে বলা যায় শরীরের ঘড়ি। এই ঘড়িই ঠিক করে দেয় কখন আমাদের ঘুম আসবে, কখন জেগে উঠব। আলো-আঁধার, দিন-রাতের দৈর্ঘ্য-সবকিছুর সঙ্গে এই ঘড়ির সম্পর্ক।

শীতের হলদে সৌন্দর্য

মো. আরিফুল ইসলাম

বাংলার গ্রাম মানেই প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, আর সেই সৌন্দর্যের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হলো সরষে ফুল। শীত এলেই গ্রামের মাঠঘাট প্রান্তরে হলুদ রঙের অপরিসীম সৌন্দর্য দেখা মিলে তা হলো সরষে ক্ষেতের হলুদ ফুল। দূর থেকে তাকালে মনে হয় যেন সবুজ মাটির বুকে কেউ সোনালি চাদর বিছিয়ে রেখেছে। সরষে ক্ষেত শুধু একটি কৃষিজ ফসল নয়, এটি বাংলার প্রকৃতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মানুষের আবেগের সঙ্গে মিশে আছে।

সরষে মূলত একটি শীতকালীন ফসল। অগ্রহায়ণ থেকে পৌষ মাসে সরষের চাষ শুরু হয় এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসে ক্ষেতজুড়ে ফুল ফোটে। ছোটো ছোটো হলুদ ফুল বাতাসে দুলে ওঠে, বেড়ে যায় ভ্রমর, মৌমাছি ও প্রজাপতির আনাগোনা। সকালের রোদে সরষে ফুল ঝলমল করে, আর সন্ধ্যায় হালকা কুয়াশায় হয়ে ওঠে মায়াবী। এ যেন স্বপ্নিল এক দৃশ্য।

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে সরষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। সরষে থেকে উৎপন্ন তেল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকখানি জুড়ে আছে। গ্রামবাংলায় এখনো অনেকে খাঁটি সরষের তেল শুধু



রান্নায় নয়, শরীর ও চুলের যত্নেও ব্যবহার করে। সরষের খৈল গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা কৃষকের অতিরিক্ত আয়ের একটি উৎস। সরষে চাষ সহজ এবং কম খরচে করা যায়। অল্প সময়ে ফসল ঘরে তোলা যায়। ধান কাটার পর খালি জমিতে সরষে চাষ করা হয়। এতে একদিকে যেমন জমি পতিত থাকে না, অন্যদিকে কৃষক লাভবান হয়।

সরষে ক্ষেত বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। যেমন কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় বার বার সরষে ফুলের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। হলুদ সরষে ফুল অনেক কবিতায় আশার প্রতীক, আনন্দের প্রতীক হিসেবেও এসেছে। গ্রামবাংলার গান, লোককথা ও গল্পে সরষে ক্ষেত যেন এক চিরচেনা দৃশ্য। শীতের সকালে সরষে ক্ষেতে হাঁটা, ফুল তোলা বা ছবি তোলার আনন্দ মানুষের জীবনে এক বিশেষ অনুভূতি তৈরি করে।

সরষে ফুল পরিবেশের জন্যও উপকারী। মৌমাছি সরষে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, যা পরাগায়ণে সাহায্য করে। এর ফলে আশপাশের অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সরষে গাছ মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। শহরের কোলাহলপূর্ণ জীবনে সরষে ক্ষেত এক প্রশান্তির প্রতীক।

সব মিলিয়ে সরষে ক্ষেত আমাদের জীবনে বহুমাত্রিক গুরুত্ব বহন করে। এটি শুধু চোখের আরাম নয়, এটি দেশের অর্থনীতি, পরিবেশের ভারসাম্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হলুদ সরষে ফুলের হাসি আমাদের মনে আশার আলো জাগায়, নতুন দিনের স্বপ্ন দেখায়। তাই সরষে ক্ষেত বাংলার প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ, যা আমাদের ভালোবাসা ও যত্নের দাবিদার। ❑

প্রাবন্ধিক



হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ ঐতিহ্য

ভেসাল

আইনাল হক

আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষে মলিন হচ্ছে বহুবিধ গ্রামীণ ঐতিহ্য। চাপা পড়ছে আমাদের ঐকান্তিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিলুপ্তির পথে হেঁটে চলেছে অনেক গ্রামীণ ঐতিহ্য- এমনই একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন ভেসাল। অঞ্চল ভেদে মাছ ধরার এ যন্ত্র বিশেষ বা ব্যবস্থাকে খেয়া বলা হয়। স্থানীয় গ্রামের ভাষায় এই জালকে বেহাল (বেল) খেয়াজালও বলে। আবার কোথাও এর আলাদা নামও থাকতে পারে। সাধারণত নদীর মোহনায় যেখানে বিপরীত দিক থেকে স্রোত আসে এমন স্থানে এটি স্থাপন করা হয়। স্রোত বা স্রোতহীন বিলের পানিতেও অহরহ ভেসাল ব্যবহার করে মাছ ধরার দৃশ্য চোখে পড়ে এই বাংলার গ্রামাঞ্চলে।



সব ধরনের মাছ ধরা গেলেও বিশেষত ছোটো মাছ তুলনামূলকভাবে বেশি ধরতে ভেসালের বিকল্প নেই। এই জাল দিয়ে সহজে মাছ আহরণ করা যায়। জালের সামনের প্রান্তে খাল বিলের পানির গভীরতা ছুয়ে থাকে এবং স্রোতের সঙ্গে আসা মাছ জালে আটকে পড়ে। এরপর জেলেরা মাছগুলো থলিতে নিয়ে আসেন।

জেলে তার শৈল্পিক কারুকাজে বাঁশের দুই মাথায় নেটের জাল বেঁধে মাছ ধরার বিশেষ এ যন্ত্রটি তৈরি করেন।

সারা রাত কিংবা রাতের শেষ প্রহরে মাছ ধরে কুয়াশা ভেজা শীতের সকালে ভেসালের পাশে রাখা জালের তৈরি বিশেষ জায়গা থেকে জেলে যখন বিক্রির উদ্দেশ্যে মাছ তুলেন সে দৃশ্য কত যে মনোরম তার বর্ণনা ভাষাতীত। চিংড়ি, টেংরা, পুঁটি, বাইলা, বাইমসহ নানা প্রজাতির দেশি মাছের দৃশ্য দেখতে ঘুরে আসতে হবে গ্রামীণ কোনো ভেসাল বওয়া নদী থেকে। কাক ডাকা ভোরে মাছের লোভে মাছরাঙা যখন ভেসালের খুঁটিতে বসে থাকে সে দৃশ্য যে কত মনোমুগ্ধকর, কত দৃষ্টিনন্দন তা একজন সৌন্দর্য পুজারি ছাড়া উপলব্ধি করতে পারবে না। পানি থেকে জাল তোলার সময় ফোঁটা ফোঁটা পানির ঝরে পড়ার স্পন্দন হৃদয় ব্যাকুল করতে যথেষ্ট। এ সময় যদি সকালের সূর্যের কিরণ পানির ফোঁটার উপর পড়ে তার সৌন্দর্য যেন মুক্তাকে হার মানায়।

নানা কারণে দিনের পর দিন খোলা পানিতে মাছের পরিমাণ কমতে থাকায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী মানুষেরা বিকল্প পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন এ পেশার চাহিদা কমছে অন্য দিকে তেমনি নতুন প্রজন্ম বঞ্চিত হচ্ছে মাছ ধরার পুরাতন ও দর্শনীয় এ পদ্ধতি দেখা থেকে। ❑

সহকারী শিক্ষক, মান্দা, নওগাঁ

পতাকা

রকিবুল ইসলাম

বাংলাদেশের এই পতাকা তার তুলনা হয় না
এই পতাকার মাপটা শুধু দশ ইস্টু ছয় না!
এই পতাকায় জড়িয়ে আছে মান-সম্মান গৌরবও
দেয় ছড়িয়ে বিশ্ব জুড়ে বিজয় ফুলের সৌরভও।

এই পতাকা মায়ের শাড়ি বোনের রাঙা টিপ তো সে
পতপতিয়ে আকাশ ছুঁবে সূর্যসম দীপ্ত সে!
এই পতাকা জাতির প্রতীক স্বাধীনতার স্তম্ভ তো
গুঁড়িয়ে দিলো শত্রুসেনার ভয়াল থাবার দম্ভ তো!

এই পতাকা একটি আকাশ হাজার পাখি আনমনে
গাইতে থাকে উড়তে থাকে সুর বাধাহীন গান মনে।
এই পতাকা এই পৃথিবীর একটি দেশের ভিত্তি যে
পতপতিয়ে দিচ্ছে জানান স্বাধীনতার কীর্তি সে...





আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জয়

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের ২৭তম আসরে ১টি গোল্ড, ৬টি ব্রোঞ্জ ও ৪টি টেকনিক্যাল পদকসহ মোট ১১টি পদক জয় করেছে বাংলাদেশ দল। গত ১৭ থেকে ২০শে ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্ট শহরের মান্ত্রা সাউথপোর্ট শার্ক কনভেনশন সেন্টারে ২৭তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড (আইআরও) অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে ডিসেম্বর এই অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ দলের পক্ষে ২৭তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরির সিনিয়র গ্রুপে স্বর্ণপদক জয় করেছেন আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল টিটু।

ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন ক্রিয়েটিভ মুভি ক্যাটাগরির সিনিয়র গ্রুপে ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নুসাইবা তাজরিন তানিশা, ফিজিক্যাল কম্পিউটিং জুনিয়র লো গ্রুপে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী জুবাইদাহ জাফরিন, ফিজিক্যাল কম্পিউটিং জুনিয়র হাই গ্রুপে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী রিদোয়ান রাব্বানী, ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি সিনিয়র গ্রুপে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের খোন্দকার মুশফিকুল ইসলাম ও স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষার্থী প্রিয়ন্তী দাস।

এছাড়া টেকনিক্যাল পদক অর্জন করেন ফিজিক্যাল কম্পিউটিং সিনিয়র গ্রুপে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ জারিফ বিন সালেক ও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নাফিয়া বাসার সুহানী। ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি সিনিয়র গ্রুপে উইলিয়াম কেরি একাডেমির শিক্ষার্থী জাইমা যাহিন ওয়ারা এবং ক্রিয়েটিভ মুভি সিনিয়র গ্রুপে স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষার্থী প্রিয়ন্তী দাস।

বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের আয়োজনে এ বছর ২৯-৩০ আগস্ট অনলাইন বাছাই পর্ব ও ১২-১৩ সেপ্টেম্বর আইআরও বাংলাদেশ ওপেন ২০২৫ প্রতিযোগিতার জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে। জাতীয় পর্বের ক্রিয়েটিভ মুভি, ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি ও ফিজিক্যাল কম্পিউটিং ক্যাটাগরির বিজয়ীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক দল নির্বাচনী ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সের বিভিন্ন মানদণ্ড বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের জন্য বাংলাদেশ দলকে নির্বাচন করা হয়। ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ দল এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ১৫টি গোল্ড মেডেলসহ মোট ৯৪টি পদক অর্জন করে। ❑

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা



বিজয় দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

শাহানা আফরোজ

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর গৌরবদীপ্ত চূড়ান্ত বিজয় আসে ১৬ই ডিসেম্বর। বিজয়ের মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশ। বিজয় শব্দের মাঝেই আছে আনন্দ। আর এই আনন্দ সবার সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজন করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ২২শে ডিসেম্বর, ১লা পৌষ তথ্য ভবনে এ আয়োজন করা হয়। বয়স বিবেচনা করে প্রতিযোগীদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়।





ক গ্রুপ (বয়স ৫-৮ বছর), খ গ্রুপ (৯-১১ বছর), গ গ্রুপ (১২-১৪ বছর)। তিন গ্রুপ মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সকাল থেকে প্রতিযোগীরা অভিভাবকদের সাথে উপস্থিত হয় তথ্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে। সেখানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগম উপস্থিত প্রতিযোগীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এরপরই গ্রুপভিত্তিক প্রতিযোগীদের নিয়ে যাওয়া হয় আয়োজন স্থলে। প্রতিযোগীদের তিনটি গ্রুপ আলাদা করে বসার পর শুরু হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল– বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ।

সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে সবাই ছবি আঁকা শুরু করে। এরই মাঝে মহাপরিচালক স্যার, পরিচালকসহ ডিএফপির অন্যান্য কর্মকর্তাগণ খুদে প্রতিযোগীদের আঁকাছবি পরিদর্শন করেন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর ছবিগুলো বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়। প্রতিটি ছবির পিছনে প্রতিযোগীদের নাম ও বয়স লেখা ছিল। তাই বিচারকগণ ছবিগুলো নিরপেক্ষভাবে বিচার





করতে পেরেছেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. জাহিদুল ইসলাম পরিচালক (চলচ্চিত্র), মোস্তফা কামাল ভঁইয়া অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক (চারুকলা ও নকশা) ও মো. ফরিদ হোসেন উপপরিচালক (চারুকলা ও নকশা)। প্রতিযোগীদের আঁকাছবিগুলো এতই সুন্দর হয়েছিল যে বিচারকরা দ্বিধায় পড়েন- ১ম, ২য় ও ৩য় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে। তবুও ছবির বিষয়বস্তু, রঙের ব্যবহার, বৈচিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচিত করা হয়। অবশেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ী সবার হাতে উপহার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। বিজয়ী বন্ধু ছাড়াও অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দেওয়া হয় শুভেচ্ছা উপহারও।

বিজয়ীদের নাম

ক গ্রুপ

প্রথম : মো. ফারহান হুসাইন আলিফ
দ্বিতীয় : নাজিবা তাহসিন
তৃতীয় : আরিশা হাসান

খ গ্রুপ

প্রথম : ঈপ্সিতা দাস সমৃদ্ধি
দ্বিতীয় : উযাইর আহনাফ আলম
আরুশা মানহা সোহা
তৃতীয় : মেহেরিমা জান্নাত জেরিন
তানহা তাবাসসুম তোহা

গ গ্রুপ

প্রথম : আভা আনজুম সুভা
দ্বিতীয় : সাইবাহ্ হোসেন
তৃতীয় : রুতবাহ জামান শিজা





শীতকালে সুস্থ থাকার সহজ উপায়

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

শীতকাল শব্দটি শুনলেই যেন মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। লেপ বা কম্বলের উষ্ণতা, পিঠে লাগানো দুপুরের রোদ, উৎসব আর ছুটির হাতছানি। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত আরামের অনুভূতির জন্ম দেয়। কিন্তু এ সময়ে অনেকের শুরু হয় হাঁচি, কাশি, নাক বন্ধ বা গলায় অস্বস্তি। কেন এমন হয়? শরীর কি এই ঠান্ডার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না?

প্রকৃতপক্ষে শীতের আগমন হলো হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময়। দিনের তাপমাত্রা কমতে শুরু করলে আমাদের শরীর একটু সময় চায় পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। এই পরিবর্তনে শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য কিছুটা অচল হয়ে যায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া সহজেই আমাদের আক্রান্ত করতে পারে। শীতের শুষ্ক বাতাস নাসাপথের ভেতরের আর্দ্রতা কমিয়ে দেয়। ফলে শ্বাসতন্ত্রে রোগের সংক্রমণ ছড়াতে সুবিধা হয়।

শরীরের নিজস্ব প্রক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য ঠান্ডায় রক্তনালী কিছুটা সংকুচিত হয়ে যায়। মাথা, গলা, নাক এরা সবাই প্রভাবিত হয়। নাকের শ্লেষ্মা ঝিল্লি কম সক্রিয় হওয়ায় ভাইরাস সহজেই প্রবেশ করতে পারে। ছোটো ছোটো লোমগুলোও ধুলো বা ভাইরাস আটকাতে কম সক্ষম হয়। তাই হাঁচি, সর্দি বা ফ্লু বেশি দেখা যায়।

শীতের পোশাকও আমাদের বিপদে ফেলতে পারে। উলের সোয়েটার, কম্বল বা লেপগুলো বছরের বেশিরভাগ সময় আলমারিতে ভাঁজে রাখা থাকে। এ সময় তাদের মধ্যে ধুলো, ময়লা ও ফাঙ্গাস জমে। আলমারি থেকে কাপড় ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যালার্জির শরীরে প্রবেশ করে। অনেকের চোখ চুলকায়, গলায় অস্বস্তি হয়। জন্মগত ভাবে যারা অ্যালার্জি বা হাঁপানির সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য এটি আরও বিপজ্জনক।

তাই পোশাক ব্যবহারের আগে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। ধোয়া যায় এমন কাপড় যেমন- সোয়েটার, শাল, টুপি এগুলো ভালো মানের ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকনো করতে হবে। ধোয়া যায় না এমন লেপ, ভারী কম্বল বা কোট



-এগুলো ছয় থেকে সাত ঘণ্টা রোদে দিতে হবে। মাঝে মাঝে উলটে দিতে হবে যাতে সব অংশে সূর্যের তাপ পৌঁছায়। এরপর ভালোভাবে ঝেড়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে ড্রাই ক্লিন করতে হবে। ইস্ত্রি করলে অতিরিক্ত তাপের কারণে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

শীতকালে তৃষ্ণা কম অনুভূত হয়, তাই অনেকেই কম পানি পান করেন। কিন্তু এটি ঠিক নয়। পরিমিত পানি পানে শরীরের বিষাক্ত টক্সিন দূর হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালো থাকে। তাই নিয়মিত কুসুম গরম জল, ভেষজ চা বা স্যুপ পান করতে হবে। এটি শুধু শরীরকে উষ্ণ রাখবে না, গলা ও শ্বাসতন্ত্রকেও আর্দ্র রাখবে। কিছু মশলার চা-যেমন আদা, দারচিনি, লবঙ্গ শরীরকে গরম রাখার পাশাপাশি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল যেমন -লেবু, আমলকি এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। শাকসবজি, বাদাম, ডাল ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার শীতে শরীরকে শক্তিশালী রাখে। চিকিৎসকরা সব সময় পরামর্শ দেন সপ্তাহে কিছু হলেও হালকা ব্যায়াম করতে। হাঁটা তার মাঝে উত্তম। এটি শরীরের রক্ত চলাচল ঠিক রাখে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ঘরের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। দিনের বেলা জানালা খুলে রাখাই ভালো। এতে বদ্ধ ঘরে জমে থাকা আর্দ্রতা ও জীবাণু দূর হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে ঘর যেন সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়। মাঝে মাঝে হালকা গরম বাতাসের জন্য হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করলে শ্বাসনালি শুকনো হয় না।

আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে কাপড় পরতে হবে। মাথা, কান, গলা ও পা ঢেকে রাখতে হবে। রাতে হালকা মোজা ও উষ্ণ সোয়েটার শরীরকে রাতের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে।

একটু সচেতনতা এবং সঠিক প্রস্তুতি থাকলে আমার এবং আপনার পরিবার নাক, কান ও গলার সমস্যার হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। প্রতিদিন ছোটো ছোটো অভ্যাস যেমন- পরিষ্কার পোশাক, নিয়মিত সুষম খাবার ও হালকা ব্যায়াম শীতকালে শরীর সুস্থ থাকার মূল চাবিকাঠি। ❑

সাহিত্য সম্পাদক, বাংলাদেশ খবর প্রতিদিন

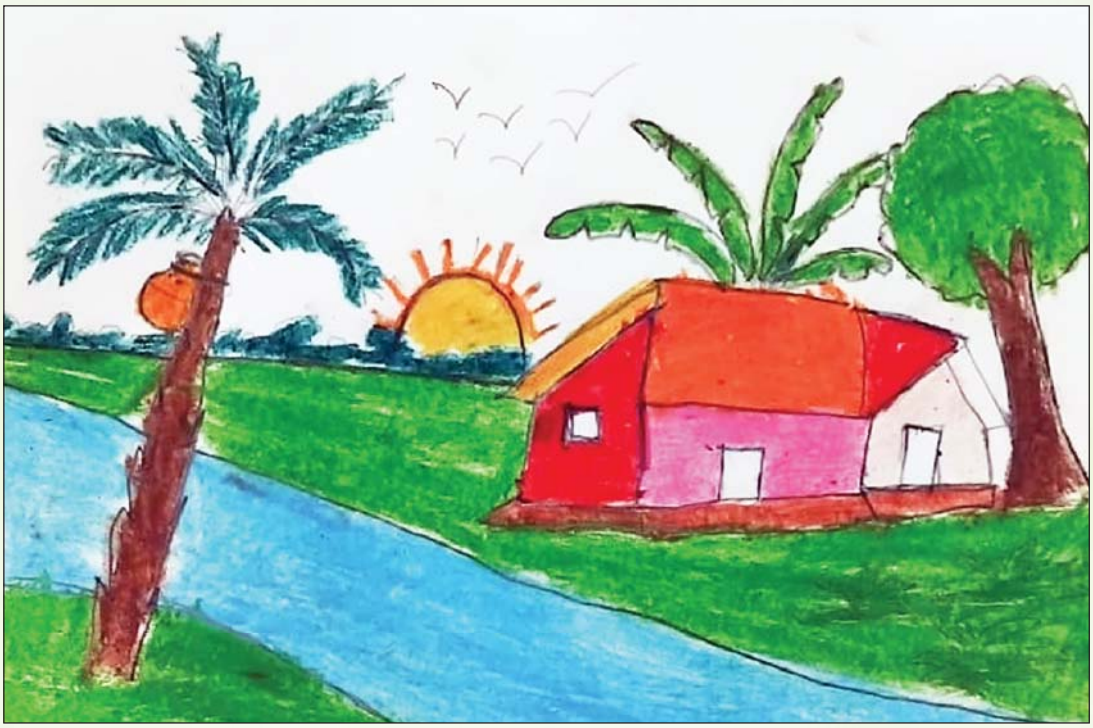
চীনের রঙিন পাহাড়

বৃষ্টি ভেজা মিষ্টি সকালে দূর আকাশে দেখা দেয় রংধনু। কিন্তু রংধনুর সাতটি রং নীল আকাশের ক্যানভাসেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এই রঙের বিস্ময়কর পাহাড়ও রয়েছে। পৃথিবীতে এমন এক পাহাড় আছে, যেখানে রংধনু থাকে মাইলের পর মাইলজুড়ে। এটি কোনো শিল্পী ও তুলির আঁচড় নয়, এটি বাস্তব। চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গানসু প্রদেশের অন্তর্গত জাংহে শহরে রয়েছে এমনই এক বিস্ময়কর রেইনবো মাউন্টেন। প্রকৃতি আর রসায়নের অনবদ্য মিশ্রণে সৃষ্টি এই রঙিন পাহাড়। রেইনবো মাউন্টেন 'দাংজিয়া ল্যান্ডফর্ম জিওগ্রাফিক্যাল পার্ক'-এর অন্তর্গত।

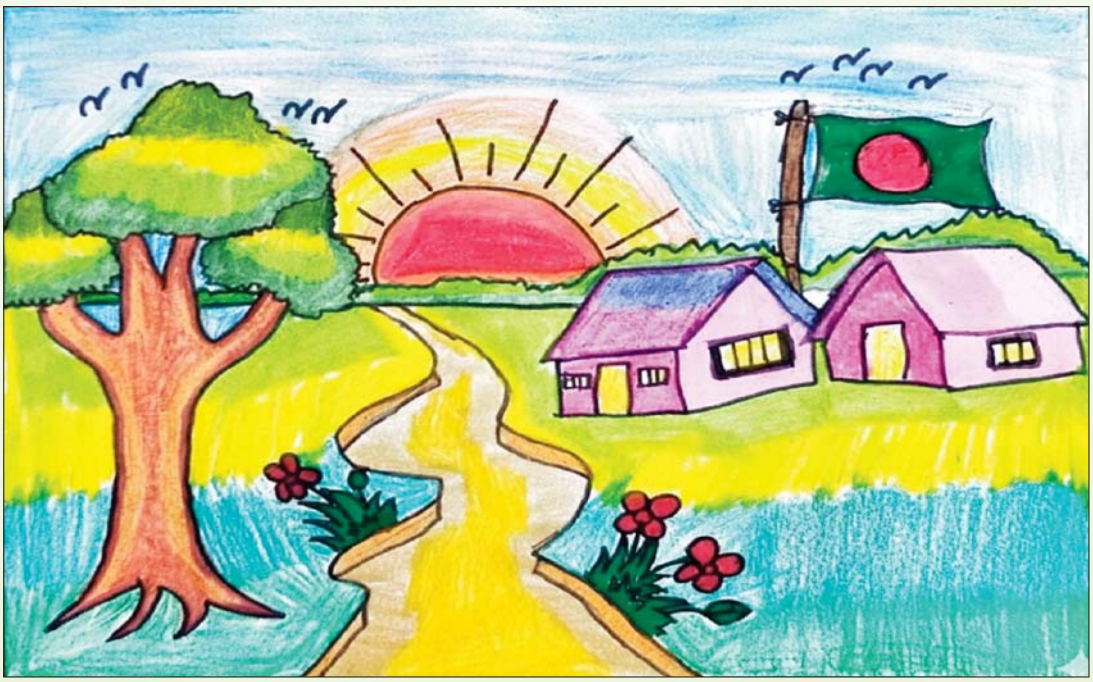


সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আড়াই হাজার মিটার উঁচুতে ১২৪ বর্গমাইল জায়গাজুড়ে পাহাড়ের অঞ্চলটি সত্যিই অবিশ্বাস্য। পাহাড়ের শরীরজুড়ে লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, কমলা, বাদামি, বেগুনি রঙের স্তরগুলো একটির পর একটি সাজানো রয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এ রঙিন সৌন্দর্যের রহস্যে লুকিয়ে আছে খনিজ পদার্থের স্তর। বালিপাথর, পলিপাথর, আয়রন অক্সাইড, সালফাইড ক্লোরাইড ও সিলিকেট এইসব খনিজের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে নানা রঙের ছটাক। গবেষকরা বলেন, হিমালয় পর্বতের অনেক আগেই এই পাহাড় গঠিত হয়েছিল। বহু বছর ধরে ঋতু পরিবর্তন, ঝড়বৃষ্টি, তুষারপাত, বিভিন্ন রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রূপ পরিবর্তন করতে করতে তৈরি হয়েছে বর্তমানের রেইনবো মাউন্টেন। এভাবেই কোটি বছর ধরে পরিবর্তনের ফলে আজকের রেইনবো মাউন্টেন দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মাঝে হাঁটার পথ তৈরি করা হয়েছে পর্যটকের জন্য। বেড়াতে গিয়ে অনেকেই স্মৃতি হিসেবে কিছু না কিছু নিয়ে ফেরেন। তবে রেইনবো মাউন্টেনের ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ কিছু নিয়ম। এখান থেকে রঙিন পাথর নিয়ে যাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। পৃথিবীর প্রায় সব পাহাড়ই সবুজে ঢাকা। কিন্তু রেইনবো মাউন্টেন আলাদা। কারণ এটি নিজের রঙে নিজেই তৈরি করেছে রংধনু। প্রকৃতির এ বিস্ময় আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবী এখনো রঙে, প্রাণে আর রহস্যে ভরপুর। রেইনবো মাউন্টেন শুধু একটি পাহাড় নয়, এটি পৃথিবীর ইতিহাসের এক রঙিন অধ্যায়।

তারান্নুম সাদিকা



নাফিসা তাসনিম স্নেহা, চতুর্থ শ্রেণি, বারহাট্টা মডেল স্কুল, বারহাট্টা, নেত্রকোণা



আয়াতুন নেছা, চতুর্থ শ্রেণি, খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ , ঢাকা



যুনায়না নাওয়ার মুলতাজিম, ষষ্ঠ শ্রেণি, শহিদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা



ফারজানা ঝুমা, অষ্টম শ্রেণি, মুকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দোহার, ঢাকা



অর্না তাবাসসুম, দশম শ্রেণি, কদমতলা স্কুল



শাহ্ মেহমেদ আফনান, তৃতীয় শ্রেণি, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা



উম্মে হাবিবা, দ্বাদশ শ্রেণি, আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-6. December 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



ডিএফপি আয়োজিত মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় 'ক' গ্রুপের খুদে আঁকিয়েদের শিল্পকর্ম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা